ইসলামের চিন্তা ও

একদল ভুল মানুষ

শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ

ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ

শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ

অনুবাদ
মাওলানা হোসাইন আহমদ

আহরার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি শরিয়া

একজন মুসলিমের কী জানা উচিৎ?	৬
ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে শরিয়া	৭
অবিভাজ্য ব্যবহারিক আইন	১২
ইসলামি শরিয়া পবিত্র ও বিশ্বজনীন	১৫
ইসলামি শরিয়া নিখুঁত ও চিরস্থায়ী	১৬
তুলনামূলক পর্যালোচনা	১৭
মৌলিক পার্থক্য	১৮
সাধারণ আইনের ওপর ইসলামি শরিয়ার প্রাধান্য	২২
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি	২৩
শাসকের আইন প্রণয়নের অধিকার	২৪
শাসক নিজের সীমা অতিক্রম করলে	২৪
শাসক কি তার সীমার ভেতরে কাজ করছে?	২৬
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ার ওপর আইনের প্রভাব	২৭
তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়ার ওপর আইনের প্রভাব	২৯
শরিয়া ও সাধারণ আইনের দ্বন্দ্ব	৩০
পরস্পরবিরোধী আইন কিভাবে বিপথগামী হয়	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরিয়ার জ্ঞান

মুসলিমদের শরিয়া জ্ঞান	৩৯
অশিক্ষিত শ্রেণী	৩৯
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী	৪১
প্রথম আপত্তি: ইসলাম ও রাজনীতি	৪৩
দ্বিতীয় আপত্তি: আধুনিকতার সাথে শরিয়া বেমানান	৫২
তৃতীয় আপত্তি: শরিয়ার কিছু বিধান অস্থায়ী	৬০
চতুর্থ আপত্তি: শরিয়ার কিছু বিধান বাস্তবায়নের অনুপযোগী	৬১
পঞ্চম আপত্তি: ইসলামি শরিয়া আইনবিদদের মতামতের উপর নির্ভরশীল	৬২
ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী	৬৮
এই দশার জন্য কে দায়ী?	৭৪
জনসাধারণের দায়	৭৪
মুসলিম সরকারগুলোর দায়	৭৬
মুসলিম সরকার প্রধানদের দায়	৭৭
মুসলিম শিক্ষাবিদদের দায়	৮১
লেখক পরিচিতি	৯০

লেখকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি মানুষকে পড়তে শিখিয়েছেন। এবং মানুষের সামনে অজানা বিষয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম উম্মী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর, যাকে আল্লাহ পাক নির্বাচিত করেছিলেন শিক্ষিত মানুষকে তাঁর পথে আহ্বান করার জন্যে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও শাশ্বত কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তার পথ দেখান; এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন, আপন নির্দেশের মাধ্যমে, আর দেখান সরল পথ। (আল কুরআন, সুরা মায়েদা,আয়াত: ১৫-১৬)

একজন মুসলিমের জন্যে সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয় কী? আমার মনে হয়, যখন সে দেখে, তার অন্য মুসলিম ভাই দিনদিন খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ক্রমাগত জ্ঞানহীন হচ্ছে, অনুভূতিহীন হচ্ছে, তার ভেতরে কোনো চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে না, এবং শরিয়াহ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ও অনিহার কারণেই এমনটা হচ্ছে, তখন ব্যাপারটা একজন মুসলিমের জন্যে সত্যিই পীড়াদায়ক হয়, অন্তহীন মর্মপীড়ার কারণ হয়।

আসলে ত্রুটিযুক্ত সেক্যুলার আইনের ওপর মুসলিম জনসাধারণের শর্তহীন আনুগত্যই তাদের জীবনকে ধ্বংস করছে, তাদেরকে অপমানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, পতনের তলানিতে নিয়ে ফেলছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মূর্খতা এবং আমাদের আলেমসমাজের ব্যর্থতা ইসলামি শরিয়াকে আজ বিরানভূমিতে পরিণত করেছে। আমাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আলেমসমাজের যোগ্যতার অভাব রয়েছে।

প্রতিটি মুসলিম কি জানে, ধর্মের ব্যাপারে তার কী বাধ্যবাধকতা রয়েছে? জানলে হয়তো এটা পূর্ণ করতে সে ব্যর্থ হতো না; ইসলামের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে সে এগিয়ে আসতো। ইসলামের সেবায় তীব্রবেগে ধাবিত হতো।

আমি মনে করি, একজন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সবচেয়ে বড় যে সেবাটি করতে পারে, সেটি হলো, তাকে ইসলামি শরিয়া শিক্ষা দেয়া। তার সামনে সেইসব ধর্মীয় বিষয় উন্মোচিত করা, যা সে জানে না।

আমি এই সংক্ষিপ্ত রচনায় ইসলামি আইনের মৌলিক কিছু উপাদান উপস্থাপন করেছি, যা প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিমের জানা উচিৎ।

কিছু বিষয়ের সঠিক ভিউ দেখিয়েছি, যা নিয়ে কিছু অশিক্ষিত লোক ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। তারা এ বিষয়ের ওপর অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে।

আমি আশা করবো, যারা সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, তাদের কাছেও এই লেখাটি ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়কে স্পষ্ট করে দেবে। যা নিয়ে তাদের ভুল ধারণা রয়েছে।

আমি এ-ও আশা করছি, এ বইটি আমাদের আলেমসমাজকে তাদের পদ্ধতি বদলাতে উৎসাহিত করবে, এবং তাদেরকে ইসলামের খেদমতে নতুন এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করবে। কেননা তারাই তো রাসুলের সর্বশেষ উত্তরসূরি, এবং আল্লাহর নবীর অনুসারী।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়তের সঠিক পথে নিয়ে আসুন।

আবদুল কাদির আওদাহ

প্রথম অধ্যায়
ইসলামি শরিয়া

একজন মুসলিমের কী জানা উচিৎ?

আমরা, মুসলিমরা, ইসলামের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে আনন্দবোধ করি। আমরা ইসলামের জন্যে গর্বিত হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনুশাসন সম্পর্কেই অজ্ঞ। এর অনেক বড় বিষয়ও আমরা সহজেই অগ্রাহ্য করি।

ইসলামের মূল উপাদান হলো যেইসব তত্ত্ব এবং মতবাদ, যা কুরআনে এসেছে, এবং রাসুল (সা.)-এর সিরাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব তত্ত্ব ও মতবাদকে এককথায় বলা হয় 'ইসলামি শরিয়া'।

এভাবে ইসলামি শরিয়া হলো পবিত্র ঐক্য, বিশুদ্ধ বিশ্বাস, ঐক্যবদ্ধ ইবাদত, ব্যক্তিগত অবস্থা, সাধারণ লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য,আইন-আদালত,অপরাধ-প্রশাসন,রাজনীতি-অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয়, যা ইসলাম প্রণয়ন করেছে। সহজ কথায়, মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ- ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইনসংক্রান্ত সকল কিছুই শরিয়ার আওতাভুক্ত।

ইসলামের মূলমন্ত্র হলো তার আইন ও আদেশ-নিষেধকে সমাজে প্রয়োগ করা। কেননা, মানুষ যদি ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে অবগত না থাকে, এর বিধিবিধান যদি প্রায়োগিকভাবে সমাজে না আসে, তবে ইসলাম টিকে থাকার কোনো মূল্য নেই। যে মানুষটি ইসলামের দেখানো পথে ইবাদত করবে না, ইসলামের আইন বাস্তবায়ন করবে না, সে ইসলামকে অমর্যাদা করার অপরাধে অপরাধী। এটা এই অর্থে যে, সে তার আমলের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ার অমর্যাদা করলো, তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। ফলে পরোক্ষভাবে সে ইসলামেরই অমর্যাদা করলো, ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো। একজন মুসলিমের এ কথাটি জানা উচিৎ।

ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে শরিয়া

ইসলামি বিধিবিধান দুই ধরনের:

এক. সেইসব প্রত্যাদেশ, যা দেয়া হয়েছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কারণে। এতে সন্নিহিত রয়েছে ইবাদত ও বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো।

দুই. রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-নীতি। সরকার ও সমাজ, এমনকি জাতিগোষ্ঠীর একক ও সম্মিলিত সম্পর্কের মতো আইন। এতে সন্নিহিত রয়েছে নীতি-নৈতিকতা, উত্তম ব্যবহার, শাস্তিমূলক আইন, সাধারণ আইন, সাংবিধানিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মতো বিষয়াদি।

এভাবে ইসলাম মিলিত করেছে ইহজাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে, রাষ্ট্র ও মসজিদকে। ইসলাম এমন একটা ধর্ম, যা সমানভাবে আলিঙ্গন করেছে ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে।

ঈমান আর বিশ্বাস হলো ইসলামের একটি অংশ। এর পাশাপাশি সরকার হলো এর দ্বিতীয় অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ সাহস করে বলতে পারেন, এটা এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উসমান ইবনে আফফান সত্যিই এ ব্যাপারটা নিয়ে বলেছিলেন-

ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران

নিশ্চয়ই আল্লাহ শাসকের (ক্ষমতার) মাধ্যমে তা প্রতিহত করেন, যা কুরআনের মাধ্যমে প্রতিহত করেন না

ইসলামের সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র সব আইনের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এই দুনিয়া ও পরকালের প্রসন্নতা পেতে সাহায্য করা। অতএব, ইহজাগতিক সকল ক্রিয়াকলাপের সাথেই ইবাদতের প্রাসঙ্গিকতা জড়িত। যেকোনো ইবাদতের প্রতিক্রিয়া যেমন জাগতিক জীবনে রয়েছে, তেমনি রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন, সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিক্রিয়াও।

এই প্রতিক্রিয়া হয়তো কোনো কর্মের পূর্ণতা, কিংবা একটি অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করা, জরিমানা আরোপ করা, অথবা একটি দায়িত্বে আবদ্ধ হওয়া, কিংবা অন্য কিছু। এ ধরনের কাজের ফল যদিও পার্থিব জীবনে রয়েছে, কিন্তু এর আরেকটি ফল রয়েছে পরকালীন জীবনে। এবং আসল ফল সেটাই।

যেহেতু শরিয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এই দুনিয়া এবং আখেরাতে সুখি করা, তাই এটাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে। কেননা এর একটি অংশগ্রহণ, আর অন্যটি বর্জন করলে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না। আইন ও বিধান সংবলিত কোরআনের যেকোনে আয়াতের লঙ্ঘন দু'টি জিনিস ডেকে আনে। একটি ইহজাগতিক, অন্যটি পরকালীন।

কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক:

এক. একজন ডাকাতের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অথবা তার হাত কেটে ফেলা, তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া, কিংবা নির্বাসনে পাঠানো। এই সবই হলো দুনিয়ার সাজা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে পরকালে ভয়ানক শাস্তিও। আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা বাধাতে তৎপর হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের একদিকের হাত এবং অন্যদিকের পা কেটে ফেলা হবে; নতুবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (আল কুরআন, সুরা মায়েদা, আয়াত: ৩৩)

দুই. অপবাদের শাস্তি কিরূপ, ইসলাম বলে দিয়েছে। কেউ যদি কোনো জঘন্য গুজব ছড়ায়, অথবা কোনো সতী-সাধ্বী মহিলার ওপর কুৎসা রটনা করে, এর জন্য তাকে দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় জায়গায় শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যারা পছন্দ করে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আল কুরআন, সুরা নূর, আয়াত: ১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلسِنَتُهُمْ وأَيْدِيْهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ - يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنَ

যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধিকৃত হবে। তাদের জন্যে রয়েছে বিপুল শাস্তি। যেদিন তাদের হাত-পা এবং জিহ্বা সাক্ষ্য দিবে, তারা যা করতো, সে ব্যাপারে। সেদিন আল্লাহ তাদের পুরোপুরি উচিৎ শাস্তি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ সত্য এবং স্পষ্টবাদী। (আল কুরআন, সুরা নূর, আয়াত: ২৩-২৫)

তিন. ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে তার জন্যে ইসলাম দু'টি শাস্তি নির্ধারণ করেছে। প্রথমটি দুনিয়ার শাস্তি। দ্বিতীয়টি পরকালের শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

হে মুমিনেরা, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হলো। (আল কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৮)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলিমকে হত্যা করে, তার দণ্ড হলো জাহান্নাম, সে চিরকাল সেখানে থাকবে। (আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত: ৯৩)

ইসলামি আইনে এমন কোনো বিচার বা রায় নেই, যার সাথে পরকালীন শাস্তির উল্লেখ নেই। আমরা যখন এমন ঘটনার মুখোমুখি হই, আল্লাহর বাণী আমাদের পথ দেখায়। নির্ধারণ করে দেয় আমাদের কর্মপন্থা। আল্লাহ পাক বলেন:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُوْنَ - أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

যে বিশ্বাস করে, সে কি অবিশ্বাসীদের মতো? না, তারা একে অপরের মতো নয়। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের বসবাসের জন্য রয়েছে জান্নাত। এটা হলো, যে কাজ তারা করেছে, তার অভ্যর্থনা। আর যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখন তারা এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে, তখনই আবার তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে, এবং বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করো, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। (আল কুরআন, সুরা সেজদা, আয়াত: ১৮-২০)

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশমতো চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়, এবং সীমা অতিক্রম করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। (আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত: ১৩-১৪)

পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম বিধান সাংসারিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার জন্য দৈবাৎ রচিত হয়নি, যেখানে ইহজাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সেটা করেছে। ইসলামি আইনের সাধারণ যুক্তি হলো- এই আইন দুনিয়াকে প্রধানত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে, বিবেচনা করে একটি ক্ষণস্থায়ী আবাস হিসেবেও। ফলে আখেরাতকে পুরস্কারের স্থান এবং চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে ধরে নেয়। তাই ইসলামি আইন মানুষকে দুনিয়াতে তার কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। ভাবতে শেখায় যে, এই কাজের ফল সে কমপক্ষে পরকালে পাবে। যদি ভালো কাজ করে, তবে এটা হবে তার কৃতিত্ব। যদি মন্দ কাজ করে, তার জন্য থাকবে প্রায়শ্চিত্ত। দুনিয়াতে একটি শাস্তি ভোগ করলেও এটা আখেরাতের শাস্তিকে রহিত কিংবা লঘুও করবে না; যদি না সে তাওবা করে।

ইসলামি শরিয়া মানবরচিত আইন থেকে স্বতন্ত্র। কেননা এটা ধর্মকে ইহজাগতিক কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ইহজাগতিক জীবনের কর্মবিধি প্রচার করে পরকালীন জীবনের জন্যে। এই কারণে ইসলামি শরিয়া মুসলিমদেরকে ইসলামের শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন জীবনে, সাফল্যে ও দুঃখে বাস্তবায়ন করতে আহবান করে। শরিয়া অনুযায়ী মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করে, শরিয়ার আহবানে সাড়া দেয়াও একধরণের ইবাদত। এটা তাদেরকে তাদের রবের আরও নিকটে পৌঁছে দেবে। এবং তারা এ জন্যে পুরস্কৃত হবে।

এ ধরনের বিশ্বাস সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতা করে। যেখানে মানুষের তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত।
কেননা, মানুষের তৈরি আইন চিন্তাশীল মানুষের বিবেক স্পর্শ করে না। যেহেতু তারা এই আইন মানে না, বা একমাত্র তখনই মানে, যখন দন্ডিত হওয়ার ভয় থাকে। ফলে দেখা যায়, কেউ যদি আইনের ফাঁক গলিয়ে কোনোরূপ ঝামেলা ছাড়াই অপরাধ করার ক্ষমতা রাখে, তাকে কোনোভাবেই দমানো সম্ভব হয় না। এ কারণে যেসব দেশ মানব-তৈরি আইন দ্বারা পরিচালিত, সেইসব দেশে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। নৈতিকতার অবক্ষয় হচ্ছে। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতার মাত্রা আরো বেশি।
আর শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে চারিত্রিক দুর্নীতি বাড়ছে। কারণ অন্যদের চেয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই কৌশলে আইনকে এড়িয়ে যাওয়া অধিকতর সহজ।

অবিভাজ্য ব্যবহারিক আইন

ইসলামি শরিয়া থেকে উৎসারিত সকল আইনই অবিভাজ্য। এটা নিছক এ জন্যেই নয় যে, এর লঙ্ঘন ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অপবিত্র করে, বরং এ জন্যেও যে, এখানে স্পষ্ট আইনি অনুশাসন রয়েছে, যা মানুষকে কিছু বিধান গ্রহণ ও কিছু বিধান বর্জন করতে নিষেধ করে। আসলে শরিয়া সকল আইনের বাস্তবায়ন চায়, তার উপর অকাট্য বিশ্বাস রাখাকে অপরিহার্য করে। এর থেকে একটু বিচ্যুতিকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ تَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدَّ الْعَذَابِ

তবে কি তোমরা কিতাবের আংশিক বিশ্বাস করো আর আংশিক অবিশ্বাস করো? যারা এমন করে, তাদের জন্যে কোনো বদলা নেই দুনিয়ার জীবনের দুর্গতি ছাড়া, এবং কিয়ামতের দিনে তাদের দেয়া হবে কঠোর শাস্তি। (আল কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৫)

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে, যা আল্লাহর আইনের এক অংশ মেনে অন্য অংশ ছেড়ে দেয়াকে নিষিদ্ধ করে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ بَيِّنُوْا فَأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয় কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পরও যারা আমার নিদর্শন ও হেদায়ত গোপন করে, যা আমি নাযিল করেছি মানুষের জন্য, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, এবং যারা অভিসম্পাত করে, তাদেরও অভিসম্পাত। কিন্তু যারা তওবা করে, সংশোধন করে এবং (সত্য) বর্ণনা করে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিই; আমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (আল কুরআন,সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৯-১৬০)

এখানে 'গোপন করা'র অর্থ হলো, কিছু আইনকে স্বীকার ও কিছু আইনকে অস্বীকার করা; কিছু আইন পালন করা, আর কিছু আইন পালন না করা। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قليلا -أولئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ - فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

নিশ্চয় যারা কিতাবের কোনো অংশ গোপন করে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং অতি কম মূল্যে তা বিক্রি করে, তারা আগুন ছাড়া খাদ্য হিসাবে আর কিছুই গ্রহণ করে না; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। আর তারা হলো সে সকল মানুষ, যারা হেদায়তের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি। অতএব তারা দোযখের ওপর কত বেশি ধৈর্য্যধারণকারী। (আল কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৪- ১৭৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُوْنَ بِااللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে বিশ্বাস করেনা, এবং ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের মধ্যে বিশ্বাসে তারতম্য ঘটাতে; আর বলে যে, 'আমরা কিছু অংশ বিশ্বাস করি এবং কিছু অংশ বিশ্বাস করি না', এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ ধরতে চায়, তারা হলো প্রকৃত অবিশ্বাসী। (আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَائَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَائَهُمْ وَاحْزَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا لِقَوْمٍ مِنَ الله يُوْقِنُونَ.

আর আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী এবং (পরিবর্তন এবং বিকৃতি থেকে) সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

সুতরাং, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করুন, তা ছেড়ে আপনি তাদের খেয়ালের অনুসরণ করবেন না। আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে ফায়সালা করুন, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা কিছু আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতে চাইছেন; আর মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। তারা কি জাহেলিয়া সময়ের বিচার কামনা করে? কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিচারক কে? (আল কুরআন, সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৮-৫০)

ইসলামি শরিয়া পবিত্র ও বিশ্বজনীন

ইসলামি শরিয়া বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর অবর্তীর্ণ। ইসলামি শরিয়া এসেছে মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্যে। আরব-অনারব, পূর্ব- পশ্চিম, সবার জন্যে। সকল পথ ও মতের মানুষের জন্যে। ইসলামি শরিয়া এসেছে ইতিহাস আর প্রথার মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে।

ইসলামি শরিয়া এমন এক ব্যবস্থাপনা, যা প্রতিটি পরিবার, গোত্র, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য এমন এক বিশ্বজনীন আইন, যা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তৈরি করতে পারেনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বলুন, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। (সুরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮)

هوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হেদায়ত ও সত্য বিশ্বাস দিয়ে, যেন অন্যান্য বিশ্বাসের উপর এই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সুরা তাওবাহ, আয়াত: ৩৩)

ইসলামি শরিয়া নিখুঁত ও চিরস্থায়ী

আল্লাহ পাক ইসলামি আইনকে পরিপূর্ণ এবং সার্বজনীন করে পাঠিয়েছেন। এটা নাযিল হয়েছে খুব কম সময়ের মধ্যে। রাসুলের মিশনের প্রথম দিন থেকে নিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। অথবা সেদিন পর্যন্ত, যেদিন এই আয়াত নাজিল হয়:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا-

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সুরা মায়েদা, আয়াত: ৩)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় শরিয়াকে পরিপূর্ণ আর চিরস্থায়ীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষভাবে তখন থেকে, যখন অন্য আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিলো মুহাম্মাদ (সা.) হলেন শেষ নবী।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবী। (সুরা আহযাব, আয়াত: ৪০)

কেউ যদি ইসলামি শরিয়াকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে, তাহলে সে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে যে, এটা পরিপূর্ণ। এতে কোনো খুঁত নেই। এতে রয়েছে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সকল সমাধান।

সবধরনের লেনদেন থেকে শুরু করে সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়, যা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইসলামি শরিয়া নির্দিষ্ট কোনো সময় কিংবা কোনো স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এমন নয় যে, এটা এক জাতির জন্য বাস্তবায়নযোগ্য আর অন্য জাতির জন্য বাস্তবায়ন অযোগ্য। এটা যেকোনো স্থান, যেকোনো সময়ের জন্যে উপযুক্ত। অনন্তকালের জন্যে প্রযোজ্য। এটা সর্বকালের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। দুনিয়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রাণও বাকি থাকবে, ইসলামি শরিয়ার কার্যকারিতাও ততক্ষণ থাকবে।

ইসলামি শরিয়াকে আজ সাইডলাইনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য নয় যে, এটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে, কিংবা এটা বদলাতে হবে। ইসলামি শরিয়ার ভিত্তি খুবই মজবুত। এটা যেকোনো স্থান ও যেকোনো সময়ের উপযুক্ত। এটা কখনো বদলায় না, এটা মানুষের তৈরি আইনের মতো বাতিলও হয় না।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলামি আইন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা জেনেছি। ইসলামি আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ হয়ে নাজিল হয়েছে, যেকোনো সমাজ ও যেকোনো পরিস্থিতির জন্যে এটা প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের তৈরি আইন তার বর্তমান লেভেলেই সীমাবদ্ধ। মানুষ যে আইন তৈরি করে, প্রথমত তা অনেক দুর্বল থাকে, পরবর্তীতে সমাজের উন্নতির অনুপাতে এটাও উন্নত হয়। এটাকে উন্নত করতে হয়। প্রতিটি কালে যখনই সমাজে উন্নতির ঢেউ আসে, পৃথিবীর উন্নতির ধারা বদলে যায়, সমাজ তখন নতুন আইন তৈরি করে নতুন সমস্যার সমাধান করে। আর এটা সেই সমাজ, যা নতুন আইন তৈরি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিবিধান ও প্রস্তুত করে। সমাজ তার প্রয়োজনে আইনের ধারা পরিবর্তন করে।

এ সব আইন নির্ভর করে সমাজের উন্নতির ওপর। মোটকথা, সিভিলাইজেশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

ইসলামি আইন আর মানুষের তৈরি আইন নিয়ে আলোচনার পর আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইসলামি আইন ও মানব-তৈরি আইনের চরিত্রের মধ্যে আমূল ব্যবধান।

ইসলামি আইন যদি মানবতৈরি আইনের মতো বিকশিত হতো, তাহলে তারা আধুনিক মতবাদকে গ্রহণ করতে পারতো না। বর্তমানে প্রচলিত মানুষের তৈরি আইন ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার হাজার বছর পর তৈরি হয়েছে।

মৌলিক পার্থক্য

ইসলামি শরিয়া ও মানব-তৈরি আইনের মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, ইসলামি আইন উৎসারিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর প্রচলিত আইন মানুষের পক্ষ থেকে। যেহেতু এটা মানুষের তৈরি। ইসলামি আইনের প্রতিটি ধারা তার প্রণেতার অবদানের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায়। অন্যদিকে মানুষের তৈরি আইনে সীমাবদ্ধতা থাকে, দুর্বলতা থাকে, ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে। সে কারণে, এই আইন বারেবারে বদলায়, এবং বদলাতে থাকে। কারণ সে বদলযোগ্য। আমরা যাকে বলি, আইনি বিবর্তন। যা সামাজিক বিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে। দু'টি আইনের উদ্দেশ্য সমান। কিন্তু ইসলামি আইন কখনো প্রতিস্থাপিত হয় না, কিংবা বদলে না। আরো সহজ করে বললে, ইসলামি আইনের বিশেষত্ব হলো-

(ক) নীতিগতভাবে ইসলামি আইনের ধারাগুলোতে এমন কিছু স্থিতিশীলতা ও বিশ্বজনীনতা থাকে, যা সমাধান দেয় মানব সমাজের সর্বকালীন সমস্যার। প্রয়োজন মেটায় সময়ের ব্যবধান, সামাজিক বিবর্তন এবং মানুষের সংখ্যার আধিক্য ও সকল বৈচিত্র্যময়তার।

(খ) ইসলামি আইনের নীতি এবং এর ধারাগুলো অবশ্যই নিখুঁত। ব্যাপক। যেকোনো স্থান-কাল ও সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে তার সমস্যা হয় না।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো হলো যেকোনো আইনের বিশেষত্ব ও সাফল্যের প্রধান শর্ত। সমাজের সমস্যাবলীর সমাধান ও সমাজের যৌক্তিক চাহিদা মেটানো আইনের কর্তব্য। বস্তুত এটা ইসলামি শরিয়ার সহজাত কাজ। এর নীতি ও বিধানগুলো বিশ্বজনীন। এই আইনের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি ১৩'শ বছরেরও বেশি। এ সময়ের মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেকবার পাল্টেছে। সমাজ ও বিজ্ঞানের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়া পাল্টায়নি। পাল্টেছে মানুষের তৈরি আইন। কারণ মানুষের তৈরি আইন সর্বদা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এটা কখনো ভবিষ্যতের ধারণা দিতে পারে না। যদিও এটা অতীতকে ধারণ করে। অন্যদিকে ইসলামি আইন আল্লাহর তৈরি। এটা ধারণ করে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা। তাঁর পরিপূর্ণতা, তাঁর মহানুভবতা। এর মধ্যে অস্থিত্ব আছে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের। এটা প্রণীত হয়েছে সকল জ্ঞানের অধিকারী, সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলার এমন এক ব্যবস্থাপনায়, যা বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকল সময়কে ধারণ করে, খাপ খাইয়ে নেয় সকল সময়ে, সমানভাবে।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত আইন হলো কিছু অস্থায়ী বিধি, যা সমাজ দ্বারা প্রবর্তিত, প্রদর্শিত ও অনুসৃত। সময়ের প্রয়োজন মেটাতে ও বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে আইনের উদ্ভব হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি এই আইনগুলো সমাজের উন্নতির সাথে তাল মেলাতে পারে না, পেছনে পড়ে যায়। ফলে সমাজের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এটা অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চাৎপদ আইনে পরিণত হয়। তখন এটাকে হালনাগাদ করতে হয়। আসে পরিবর্তনের প্রশ্ন। তাই মানুষের তৈরি আইন শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এর বেশি নয়। কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এটা মানানসই হলেও পরিস্থিতির

পরিবর্তন ঘটলে তাকেও পরিবর্তন করতে হয়। অপরদিকে ইসলামি আইন হলো চিরস্থায়ী আইনের সমষ্টি। যার নীতি ও অবস্থান কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। কারণ স্বয়ং আল্লাহর মাধ্যমে এই আইনের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু মানুষের তৈরি আইন সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ঘনঘন বদলাতে হয়। বিচিত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির মুখে একে সাইজ করতে হয়। কাটছাট করতে হয়। তাই তো দেখা যায়, দীর্ঘকাল ধরে এভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন চলতে থাকায় মানবরচিত আইন শরিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের তৈরি আইনে এতো রূপান্তরের পরেও ইসলামি শরিয়ার নীতি ও শ্রেষ্ঠত্ব এখনো বহাল। ইসলামি শরিয়া প্রমাণ করেছে, যেকোনো কালের যেকোনো সমাজের উন্নতি ও প্রগতির সাথে সে চলতে সক্ষম। মানবতার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সে-ই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।

এই চমৎকার সত্য ইসলামি শরিয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় সংযুক্ত হয়েছে। এভাবে তাকালে দেখা যায়, ইসলামি অনুশাসন এখনও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে আপনি পরামর্শ করুন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ

এবং (তারা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সমাধান করে। (সুরা শূরা, আয়াত: ৩৮)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা একজন অন্যজনকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না। (সুরা মায়িদা,আয়াত: ২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 'ইসলাম নিজের এবং অন্যের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ করেছে।'

কুরআনের এই বক্তব্য এবং ইসলামি শরিয়ার ঐতিহ্য কতো সাধারণভাবে এর বিশালতা প্রকাশ করে। এটা এমন নমনীয়তা প্রকাশ করে, যা অতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এটা এমন এক পরামর্শ নীতি প্রতিষ্ঠা করে, যা একটি সরকারের মূল বুনিয়াদ। যার কারণে সমাজের উপর কোনো ক্ষতি কিংবা অবিচারের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে সেখানে ভালো এবং ন্যায়ের প্রবণতা বেড়ে যায়। এই সব নীতির কারণেই ইসলামি শরিয়া এমন এক উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মানুষের পক্ষে সেখানে পৌঁছা কোনো কালেই সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, শরিয়ার উদ্দেশ্য হলো সমাজকে পথ দেখানো, সুশৃঙ্খল করা এবং সঠিক নেতৃত্ব তৈরি করা। আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ পৃথিবী গড়ে তোলা। এ কারণে যখন তা প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলো, তার গুণাগুণ ও রসদ ছিলো সেই সময়ের চেয়ে অনেক অনেক অগ্রগামী। আজও সেই গুণাগুণ শরিয়ায় বিদ্যমান। আজও বর্তমানের চেয়ে এটা অনেক উন্নত, অগ্রগামী। ইসলামি শরিয়ায় এমন সব নীতি ও থিউরীর সম্মিলন ঘটেছে, যা অনুধাবন করতে অমুসলিম সমাজের হাজার বছরের চেষ্টা ও সাধনা লেগেছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর তারা এই আইনের হাকিকত জানতে ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা শরিয়া আইন প্রকাশ করে গোটা মানবজাতিকে সময় ও শক্তি ব্যয় করা থেকে রক্ষা করেছেন। এই আইন দৃষ্টান্তমূলকভাবে পরিপূর্ণ এই ধারণার সাথে যে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক ও সম্মানজনক পথের দিকনির্দেশনা দেয়া। মানুষকে উন্নতির পথ দেখানো, যাতে সে একটি পবিত্রতম মান অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। বস্তুত শরিয়ার চাহিদা এটাই। সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতেই সাধারণ আইনের উৎপত্তি।

সমাজকে পথ দেখানো কিংবা পরিচালিত করার জন্য এটা প্রণীত হয়নি। বিষয়টি এই কথার ব্যাখ্যা দেয় যে, এই আইন সমাজের উন্নতির সাথে পিছিয়ে পড়ে। রাষ্ট্র যখন নতুন মতবাদ গ্রহণ করতে শুরু করে, আইন তখন সমাজকে পথ দেখাতে এবং বিন্যস্ত করতে নতুন ধারা আরোপ করে। জনগণকে একটি নির্দিষ্ট মতবাদের দিকে পথনির্দেশ করতে এবং নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে আইনি সংশোধনী আনতে থাকে। এই অবস্থা রাশিয়া, জার্মানি, তুরস্ক, ইতালি এবং অন্যান্য বহু দেশের। এভাবে মানুষের তৈরি আইন অবশেষে তা-ই গ্রহণ করতে আসে, যা ইসলামি শরিয়া ১৩'শ বছর পূর্বে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সাধারণ আইনের ওপর ইসলামি শরিয়ার প্রাধান্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা হয়তো অনুমান করতে পেরেছি, ইসলামি শরিয়া মানুষের তৈরি আইনের উপর প্রধানত তিনভাবে প্রাধান্য পায়-

এক. পরিপূর্ণতা: পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে ইসলামি শরিয়া মানুষের তৈরি আইনের ওপর প্রাধান্য রাখে। এই আইন নিখুঁত হয়। এবং পরিপূর্ণতা ধারণ করে। জুডিশিয়াল সিদ্ধান্তের প্রতিটি পর্যায়ে যার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান সময়, সাধারণ ভবিষ্যৎ এবং দূরবর্তী ভবিষ্যতে মানবসমাজের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় ধারণা দেয়।

দুই. শ্রেষ্ঠত্ব: ইসলামি আইনের নীতি সবসময় সামাজিক মর্যাদার উপরে অবস্থান করে। মানুষের মর্যাদা যতই উপরে উঠুক না কেন, যেকোনো বিষয়বস্তুর ব্যাপারে শরিয়া নিজের উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে

তিন. স্থায়ীত্ব: ইসলামি আইন মনুষ্য তৈরি আইনের মতো নয়। তার বিশেষত্ব হলো তার অপরিবর্তনশীলতায়, যেহেতু তার মৌলিক ধারাগুলো পরিবর্তন ও ঘষা মাজার কোনো বিষয় নয়। মোটকথা, এর ভান্ডার প্রতিটি সমাজ ও কালের জন্য অতুলনীয়ভাবে উপযোগী।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের কাজকে তদারকি করার জন্য ইসলামি আইন মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রণীত হয়েছে। এটা প্রণীত হয়েছে মানুষের সব জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসাবে। তবে ইসলামি আইন মনুষ্য তৈরি আইনের মতো আংশিক ও সম্পূরক কোনো বিষয়ের ওপর বিস্তারিত ধারা দেয়নি। কিন্তু সাধারণ প্রাণবন্ত বিষয়ে স্বর্গীয় বক্তব্য দিয়ে সেই সক্ষমতা অর্জন করেছে। এমনকি যখন কোনো সম্পূরক বিধান উল্লেখ করেছে, তা এ জন্য যে, এই ইস্যুকে মৌলিক বিধান হিসেবে ধরা হয়েছে; আর তার অভ্যন্তরে ছোটোখাটো প্রশ্ন চলে এসেছে।

ইসলামি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক আদেশ ইসলামি আইন-তার বিধানের সাধারণ ধারাকেও যথার্থভাবে বিবেচনায় আনে। তার স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যে তার ধারণা প্রতিফলিত হয় এবং তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে। শরিয়ার এইসব ভিত্তির ওপর এর বৈধ অবয়ব তৈরির জন্য আইনজ্ঞ ও আইন প্রণেতাদের হাতে দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছিলো। যাতে এই স্পষ্ট বিধান অনুযায়ী প্রারম্ভিক আইন প্রণয়ন করা হয়। যা খুঁটিনাটি ও সম্পূরক ইস্যুকে নিয়ে আসবে এবং যা ইসলামের দেয়া মৌলিক বিধানের পরিধির মধ্য থেকে হবে।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে আইন প্রণয়নের একমাত্র পদ্ধতি হলো, তার নিজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব, পরিপূর্ণতা ও অপরিহার্যতাকে বজায় রাখবে। তার মতবাদ ও মূলনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য থাকবে। সমাজে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দিবে। ন্যায়বিচার ও সমতা নিয়ে আসবে এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে মানবকল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত করবে। এভাবে তাদেরকে অগ্রগতি ও উৎকর্ষতার পথে প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করবে। স্থায়িত্ব এবং সংজ্ঞায় এই বিষয়টি জরুরি। কোনো সাময়িক ঘটনার ওপর কোনো বিধান নির্ধারিত হবে না; যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে বিধানও পাল্টে যাবে।

শাসকের আইন প্রণয়নের অধিকার

যদিও ইসলামি শরিয়া শাসককে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, কিন্তু তা অবাধ অধিকার নয়। আদতে এটা এমন অধিকার- যা সীমাবদ্ধ। ইসলামি শরিয়া শাসককে এই শর্তে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয় যে, শাসক যে আইন প্রণয়ন করবে, তা অবশ্যই ইসলামি বিধানের সাধারণ মূলনীতি, চেতনা ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অতএব এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আইন প্রণয়নের বৈধতাকে দু'টি শ্রেণীতে আবদ্ধ করে-

(ক) নির্বাহী আইন: এর উদ্দেশ্য হবে ইসলামি আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয়া। এই পরিস্থিতিতে, প্রণীত আইন তখন সেসব বিধানে রূপ নেয়, যা বর্তমান সরকারি কর্মকর্তাগণ তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের দিকনির্দেশের জন্য ইস্যু করে। এই উদ্দেশ্যে যে, এটা সংশ্লিষ্ট আইনের নির্ণায়ক বা সহযোগী হিসেবে কাজ সম্পন্ন করবে।

খ) প্রশাসনিক আইন: এই আইনের উদ্দেশ্য হলো, সমাজকে সংঘটিত করা এবং ইসলামি আইনের আলোকে সমাজের প্রয়োজন মেটানো। সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত এই আইন প্রণয়ন করা হয় না। এই আইন তখন প্রণয়ন করা হয়, যখন শাসন করার জন্য শরিয়ায় তুলনামূলক কোনো বিধান থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন করলে শাসকের প্রণীত আইন অবশ্যই মূল বিধানের মৌলিক মূলনীতি ও চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

শাসক নিজের সীমা অতিক্রম করলে

এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত যে, শাসকের সকল কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধতা পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ইসলামি আইনকাঠামোর মধ্যে থাকবে। ইসলামি শরিয়ার বিচারিক সিদ্ধান্ত ও চেতনার সঙ্গে তাদের কাজ সংগতিপূর্ণ থাকবে। একমাত্র তখনই শাসক তার অধিকার অনুযায়ী কাজ করছে বলে ধরা হবে। এবং তাকে মেনে চলতে হবে।

কিন্তু শাসক যদি এমন আইন ইস্যু করে, যা শরিয়া আইনের বিপরীত, তখন তার কাজ ও নীতি বিতর্কিত এবং অবৈধ হয়ে যায়। এই বক্তব্যের ভিত্তিমূল হলো কুরআনের আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি উপস্থাপন করো। (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার মীমাংসা আল্লাহর কাছে। (সুরা শূরা, আয়াত: ১০)

এভাবে আল্লাহ পাক তার নিজের আনুগত্য, তার নবীর আনুগত্য এবং শাসকের আনুগত্য আমাদের উপর অপরিহার্য করেছেন। এই আনুগত্যের নির্দেশ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এই নির্দেশ নবী কিংবা শাসক দেননি। যদি শাসক আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, তাহলে সে আমাদের উপর কোনো ক্ষমতা রাখে না। সে আমাদের উপর বিশ্বস্ততা কিংবা আনুগত্যের আশা করতে পারে না। তখন তার আইনকানুন এবং কর্তৃত্ব অবৈধ হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেন:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

সৃষ্টির কোনো আনুগত্যই পালন হবেনা স্রষ্টার (আল্লাহ) অবাধ্যতার মাধ্যমে। এবং

إنما الطاعة في المعروف

শুধুমাত্র ভালো কাজেই আনুগত্য করা যাবে।

من امركم منهم بمعصية فلا سمع له و لا طاعة

তাদের কেউ তোমাদেরকে গোনাহর আদেশ করলে তাদেরকে মানা এবং শোনার কোনো অনুমতি নেই।

শাসক কি তার সীমার ভেতরে কাজ করছে?

গত শতাব্দীর পর, বেশিরভাগ মুসলিম দেশের শাসকরা বিভিন্ন আইনি বিষয়ে এমন সব ধারা অনুসরণ করছে, যার সমান প্যাটার্ন ইউরোপীয় দেশগুলোও অনুসরণ করে। বাস্তবতা হলো, তারা ইসলামি শরিয়ার কোনো রেফারেন্স ছাড়াই ইউরোপের সাংবিধানিক, অপরাধ, দেওয়ানি, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য আইনের ধারাগুলোর অনুসরণ করছে। যদিও নামমাত্র কিছু বিষয়ে তারা শরিয়াকে অনুসরণ করে। যেমন-ওয়াকফ আইনের ক্ষেত্রে। বিষয়টি স্বীকার করা শুধুমাত্র ভদ্রতা হবে এই অর্থে যে, এই ধারাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ধারা ইসলামি শরিয়ার মূলনীতির সাথে খাপ খায়। এ সব ধারা তার নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে না। কিন্তু এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, এই ধারাগুলোর অধিকাংশই আমাদের শরিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এগুলো আমাদের শরিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, এ সব ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে বৈধতা দেয়, মদপানের অনুমতি দেয়, ইসলাম যা প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এখানে আমি কিছু মুসলিম দেশের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যারা স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় আইনকে গ্রহণ করেছে। তবে এই দেশগুলোর ইসলামি শরিয়ার বিরোধিতা করা আসল উদ্দেশ্য নয়। ১৮৮৩ সালে প্রণীত ইজিপশিয়ান প্যানেল আইনের চেয়ে ভালো দলিল আর কিছু হতে পারে না। যেখানে আর্টিকেল 'আই' ব্যাখ্যা করেছে- 'এটা সরকারের বিশেষ ক্ষমতা যে, যারা জননিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি করবে, সেসব ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপ করা হবে। এ ধরনের অপরাধ এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা সরাসরি শাস্তির উপযুক্ত।'

তদ্রুপ এই আইন শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা বাস্তবায়নের অধিকার বৈধ শাসককে দিয়েছে। 'তবে সেটা যেকোনো মাত্রার যেকোনো মামলায় যেন একজন ব্যক্তির ইসলাম স্বীকৃত আইনি অধিকারকে হরণ না করে।' এই ধারাটি নকল করা হয়েছিলো ১৮৫৩ সালে জারি করা তুর্কী আইন থেকে।

আমার মতে, অতীত বা বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের শাসক কখনো ইসলামি আইনের বিরোধিতা করার চিন্তা করেনি। অথচ এ ধরনের দেশের অনেক আইনই ইসলামি শরিয়ার মূলনীতির বিপরীতে প্রণীত হয়েছে। এই আপাত বিরোধিতার কারণ হলো, এইসব আইনের লেখক হয়তো ইউরোপীয়ান, ইসলামি শরিয়া সম্পর্কে যাদের নূন্যতম ধারণা নেই। অথবা এমন মুসলিম, যারা ইউরোপীয় আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছে; কিন্তু ইসলামি শরিয়ার সাথে তারা নিজেদের পরিচয় ঘটায়নি।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ার ওপর আইনের প্রভাব

মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় আইন আসার ফলশ্রুতিতে স্পেশাল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো। এই কোর্টগুলোর বিচারক হিসেবে যারা নিয়োগ পেয়েছিলো, তারা হয়তো ইউরোপীয়ান, অথবা দেশীয় এমন শিক্ষাবিদ, যাদের ইসলামি আইন সম্পর্কে নূন্যতম পড়াশোনা নেই। নতুন স্পেশাল কোর্ট সবধরনের বিচারের ক্ষেত্রে নিজেদের আইনগত কর্তৃত্বের অধিকার নিজেদের এখতিয়ারাধীন করে। এই এখতিয়ার কার্যত ইসলামি শরিয়াকে প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বিশেষ করে যখন নতুন কোনো প্রতিষ্ঠিত কোর্ট নিজস্ব আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন প্রয়োগ করে না। তাছাড়া, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন আইনের ফিলোসফি শিক্ষা দিতে বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এ ধরনের স্কুলগুলোতে তারা স্বাভাবিকভাবে ইসলামি শরিয়া উপেক্ষা করে ইউরোপীয় আইনের ধারাগুলো শিক্ষা দিতে থাকে।

লোকদেখানো দু'-একটি বিষয় ছাড়া ইসলামি শরিয়ার আর কোনো বিষয় সেখানে স্থান পায়নি। যেমন ওয়াকফের মতো বিষয় তারা শিক্ষা দিতো। এ ধরনের আচরণ একটি দুঃখজনক উপসংহারে পৌঁছায়। যেহেতু প্রায় সব আইনজীবী, যারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের ছিলো, তারা ইসলামি আইনের নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। যা অতি দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, তাদের এই মূর্খতা তাদের ধর্মের বিচারব্যবস্থা ও বিধানের ব্যাপারে মূর্খতার শামিল। যেটা সেই সকল দেশের ধর্ম, যারা নিজেদের ইসলামিক বলে দাবি করে। তাদের এই অজ্ঞতা ইউরোপীয় আইনের দুর্বল ধারাকে প্রবর্তন ও ইন্টিগ্রেশন করতে পরিচালিত করেছে। যদিও তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ার প্রকাশিত ব্যবস্থার চেয়েও ভিন্ন ছিলো। যেমন, মিশরীয় প্যানেল আইনের মতে, 'তার সকল ধারা প্রয়োগ হবে এমনভাবে, যেন কোনোভাবে ব্যক্তির ইসলামি শরিয়াপ্রদত্ত অধিকারের কোনো ক্ষতি না হয়।' কিন্তু এই জোরালো শর্তের পরেও, মিশরীয় আইনবিদরা কোনো প্রয়োজন মনে করেনি, ইসলাম ঘোষিত সেসব খুঁটিনাটি অধিকারের সাথে নিজেদের পরিচয় ঘটাতে। তারা তাদের সামর্থ সীমাবদ্ধ রেখেছে ব্যক্তির অধিকার শিক্ষায়, যা ফ্রেঞ্চ লিগ্যাল সিস্টেমে আছে এবং যা কিছু ফ্রেঞ্চ জুরিরা ব্যাখ্যা করেছে, তার মধ্যে। ফ্রেঞ্চ আইনের ভিত্তির ওপর সবকিছুর বৈধতা যাচাই করেছে। আর এতে মিশরীয় আইনবিদরা দু'টি ফ্যাক্টরে প্রভাবিত হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

প্রথমত, তারা ইসলামি শরিয়া শিক্ষা করেনি। এর মূলনীতি ও রসদের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না।

দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের ইউরোপীয় আইনবিদদের রুল ও অভিমতের ওপর বেঁধে ফেলেছে। বিশেষভাবে ফ্রেঞ্চদের কাছে, ফ্রেঞ্চরা যা অনুমোদন করেছে, তারাও তাই অনুমোদন করেছে। তারা যা নিষিদ্ধ করেছে, এরাও তাই নিষিদ্ধ করেছে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইউরোপীয় আইনবিদরা ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ মূর্খ।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়ার ওপর আইনের প্রভাব

যেহেতু মানবরচিত আইন গ্রহণের কারণে ইসলামি শরিয়া ব্যবহারিকভাবে অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই শরিয়ার ওপর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব আইনের কোনোই প্রভাব নেই।

ইসলামি শরিয়ার বিধান ও রুলগুলো এখনো বৈধতার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন। এটা যেকোনো ব্যাপারে চমৎকার উপযুক্ত।

আইন ও বিধানশাস্ত্রের একটি বুনিয়াদী নিয়ম হলো, কোনো বিধানই তার সমমান অথবা এরচেয়ে উন্নত বিধান ছাড়া রহিত কিংবা বিলোপ করা যায় না। অন্য কথায়, আইনি বিধান কখনো বিলুপ্ত করা যাবে না, যদি না বিধানদাতা এর সমমান অন্য বিধান প্রণয়ন না করেন। অথবা এমন একটি কর্তৃপক্ষ, যারা সমান পর্যায়ের বিধানিক এখতিয়ার রাখেন। অথবা এমন ক্ষমতাবান বিচারব্যবস্থা, যা প্রাথমিক বিধানকর্তার অনুরূপ।

সুতরাং, ইসলামি শরিয়াকে রহিত করার মতো একমাত্র বিধান হবে কুরআনের আয়াত কিংবা সুন্নাহ। কেননা, আমাদের শরিয়া হলো কুরআন ও রাসুলের হাদীস।

কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও অতিরিক্ত কুরআনের আয়াত আসতে পারে না। কেননা তা আসার সমাপ্তি ঘটেছে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে। আর কখনো সুন্নাহও আসবে না, কারণ রাসুল (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন।

যাইহোক, কুরআন ও সুন্নাহর মতো সমমানের আইন জারি করার মতো বৈধ কর্তৃপক্ষ হওয়ার সাহস কেউ রাখে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মতো আইনের কর্তৃপক্ষ হওয়ার এবং সমান বিধান জারি করার চেষ্টা করেনি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের শাসকদের আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু শাসন করার ক্ষমতা আছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামি শরিয়া স্পষ্ট এবং অকাট্য। আর তা ওহী নাযিল শুরু হওয়া থেকে রাসুল (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে ছিলো।

শরিয়া ও সাধারণ আইনের দ্বন্দ্ব

এইসব দৃষ্টান্তে যেখানে মানুষের তৈরি আইনের ধারা ও ইসলামি শরিয়ার নির্দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাতে ইসলামি শরিয়া ব্যবহার করা উচিৎ। মানব তৈরি আইন নয়। আর এটা তিনটি জোরালো কারণে করতে হয়-

প্রথমত, শরিয়ার বিধানগুলো এখনও অকাট্য এবং যেকোনোভাবে তা কখনো বিলুপ্ত করা যায় না। যেখানে মানুষের তৈরি আইন বাতিলযোগ্য। তার মানে হলো, মানুষের তৈরি আইন থেকে ইসলামি শরিয়ার সেসব প্রশংসনীয় ধারাগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত, শরিয়ায় মানদন্ড হলো, যা কিছুই তার ধারার বিপরীত পরিচালিত হয়, তা বাতিল। তা প্রতিপালন এবং মানা উচিৎ নয়। এই সীমাবদ্ধতায় যেকোনো আইন শরিয়ার বিপরীতে গেলে তা অকার্যকর ও বাতিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত, আইনের প্রাথমিক মূলনীতি অনুসারে যেসব আইন শরিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে যাবে, এবং সে অনুসারে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাবে, তা আপনা আপনি বাতিল ও অকার্যকর হয়ে যাবে।

পরস্পরবিরোধী আইন কিভাবে বিপথগামী হয়

সমাজের প্রয়োজন পূরণে মূলত মানব-তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সকল ব্যক্তির মাঝে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দল বা সংঘ গড়ে তোলা জরুরি। সমাজের অন্যতম একটি প্রধান প্রয়োজন হলো তার ধর্মমত, বিশ্বাস এবং সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করা। ইসলামি দেশগুলোতে সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামি ভিত্তির উপর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিশ্বাস ও ধর্ম হলো ইসলাম। এ ধরনের সমাজে যেকোনো আইনই প্রবর্তন করা হোক না কেন, তা পূর্ণরূপে ইসলামি শরিয়ার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে হওয়া উচিৎ। দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমান মুসলিম দেশসমূহে যে আইনগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে এই অবস্থা নেই। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী, এর অনেকগুলো ইসলামি শরিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এইভাবে আইনের স্খলন ঘটে এবং আইন যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়। এই পরস্পরবিরোধী আইন এক সাথে তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। আমরা যদি ইসলামের নীতির সাথে নিজেদের পরিচিত করি, তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, কিভাবে এই সমান বিধান ইউরোপকে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তির মধ্যে শান্তি অনুধাবন করতে পথনির্দেশ করেছিলো। কিন্তু মানব-তৈরি আইন একেকটি ইসলামি সমাজে প্রধান মর্মান্তিক উপাদান, যা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। তার সদস্যদের অপমান করে এবং যা তাদের মনে তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে উদ্দীপ্ত করে। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই আইনের প্রতি বৈরি করে তোলে। অস্থিরতা, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে প্ররোচনা দেয়। এ ধরনের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রথমত, যেসব আইন ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক, তা গ্রহণ করতে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে নিষেধ করে। যেকোনো ধারা, যা শরিয়ার বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্য রাখে না, অথবা তার স্বাভাবিক রুল ও চেতনার সাথে মিলে না, তা ইসলাম কুরআনের আয়াত ধারা স্পষ্ট নিষেধ করেছে।

সেসব আয়াতে আল্লাহ পরিস্কারভাবে দু'টি বিকল্প দেখিয়েছেন, যে, হয়তো মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিবে এবং তার অনুসরণ করবে, যা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। নতুবা নিজেদের কামনা ও অভিলাষের অনুসরণ করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সুরা আল কাসাস, আয়াত: ৫০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহর মোকাবিলায় তারা আপনার কোনোই উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের ওলী (বন্ধু, অভিভাবক, সহযোগী)। আর আল্লাহ পরহেযগারদের ওলী। (সুরা আল জাসিয়া, আয়াত: ১৯)

এ ছাড়া কুরআনে এসেছে:

اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কর না। (সুরা আল আ'রাফ, আয়াত: ৩)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ কখনও কোনো বিশ্বাসী মুসলিমকে তার আইন ব্যতীত অন্য আইন মেনে নেয়ার অনুমোদন দেন না। অথবা যেকোনো বিধি, যেটা তার বিধানের সাথে বেমানান। আসলে মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন, তার দেওয়া সিদ্ধান্ত ছাড়া যেকোনো জুডিশিয়াল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে। এই বিবেচনায়, অন্যসব আইন মেনে নিলে দোযখের ভয়ানক আযাব পেতে হবে এবং তা শয়তানের পূজার শামিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ . وَ قَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا .

তুমি কি তাদের দেখ নাই, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে। অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সুরা নিসা, আয়াত: ৬০)

এর অর্থ হলো, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সা.) যা বলেছেন, তা ব্যতীত বিচারের জন্য আইন প্রনয়ণ করার অর্থ; শয়তানের কু-মন্ত্রণা অবলম্বন করা ও তার রায় মেনে নেওয়ার শামিল। এ অবস্থায় যে কেউ 'শয়তানী শক্তি' হতে পারে। এটা হয়তো তার পূজার মাধ্যমে, অথবা তার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, অথবা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। যেকোনো দল ও জাতির মধ্যে এই 'শয়তানী শক্তি' হতে পারে, যাকে মানুষ তাদের বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষমতা দেয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) ছাড়া। অথবা যাকে তারা পূজা করে এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে অনুসরণ করে।

অথবা এমন সব ব্যাপারে অনুসরণ করে, যা আল্লাহর আনুগত্যকে অকার্যকর করে দেয়। একবার যখন ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান নিয়ে আসে, সে আরেকজনের সমাধান গ্রহণ করতে পারে না। সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিচার-ফায়সালা মেনে নিতে পারে না।

তৃতীয়ত, বিশ্বাসী মুসলিমদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) যে বিধান দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নিজেদের পছন্দ, অথবা সন্তুষ্টির অনুমতি দেন না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। (সুরা আহযাব, আয়াত: ৩৬)

চতুর্থত, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল জুডিশিয়াল সিদ্ধান্ত এবং বিধিবদ্ধ আইন ওহী অনুযায়ী হতে হবে। যারা তার ফয়সালা মেনে নিবে না, তাদেরকে কাফের, জালেম ও ফাসেক সাব্যস্ত করা হবে। তা ছাড়া তাদের তিনি অপরাধী এবং বিদ্রোহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلِئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত: ৪৪)

তিনি আরও বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلِئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই জালেম। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত: ৪৫)

তিনি আরও বলেন:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত ৪৭।)

মুসলিম আইনবিদ ও কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, যেসব মুসলিম বিধানে পরিবর্তন আনে, অথবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সাথে সাংঘর্ষিক আইন পাস করে, ওহীর আইন ত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া আইন জারি করে, তাহলে সে উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত তিনটি শ্রেণীর যেকোনো একটিতে পড়বে।

পঞ্চমত, আল্লাহ পাক তার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে তাঁর রাসুলের ফায়সালা মেনে নেওয়ার ওপর শর্তারোপ করেছেন। যেটা মুসলিমদের মধ্যে সব ইস্যুতে হতে পারে। এই শর্তে যে, এই স্বীকৃতি কোনো বিরক্তিবোধ কিংবা বিদ্বেষের সাথে নয়। কিন্তু এটা হতে হবে দন্ডাদেশ ও সমর্পনের সংযোজন হিসেবে। আল্লাহ ঘোষণা দেন:

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সুরা নিসা, আয়াত: ৬৫)

ষষ্ঠত, ইসলামি শরিয়া তার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো কিছুকে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি এটা যদি শাসকের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়, তারপরেও।

তার যা-ই ক্ষমতা থাকুন না কেন, এটা এই কারণে যে, শাসকের বিধানিক অধিকার এই শর্তসাপেক্ষে যে, এর ফলাফল অবশ্যই ইসলামি শরিয়ার সাধারণ মূলনীতি এবং বিধানিক চেতনা অনুসারে হতে হবে। যদি শাসক সীমা অতিক্রম করে অন্যায় স্বাধীনতা নেয়, তাহলে তার রায় ওহী দ্বারা নিষিদ্ধ আইনকে অনুমোদনযোগ্য আইনে রূপান্তরিত করে না। অথবা এটা এই আইন গ্রহণ করতে মুসলিমকে বৈধতা দেয় না। অন্যদিকে, এটা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যকীয় যে, সে এমন আইন অমান্য করবে, যা নিষিদ্ধ কাজ করতে অনুমোদন দেয়। সে তা সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, যেকোনো মানব শাসকের আনুগত্য ও বশ্যতা মেনে নেওয়া অকাট্য নয়। আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া সীমার ভেতরে। মহান আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ - فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلَ - ذَلِكَ - خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসুলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। (সুরা শুরা আয়াত: ১০)

শাসকের আনুগত্যের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে হাদিসে সাব্যস্ত আছে। রাসুল (সা.) বলেন:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

সৃষ্টির কোনো আনুগত্যই পালন হবে না স্রষ্টার (আল্লাহ) অবাধ্যতার মাধ্যমে।

এবং انما الطاعة في المعروف *"শুধুমাত্র ভাল কাজেই আনুগত্য করা যাবে "*

. من امركم منهم بمعصية فلا سمع له و لا طاعة

তাদের কেউ তোমাদেরকে গোনাহর আদেশ করলে তাতে তাদেরকে মানা এবং শোনার কোনো অনুমতি নেই।

রাসুলের সাহাবা, আলেম-উলামা এবং মুসলিম আইনবিদদের এই মতের উপর সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত্য আছে, যে, শাসকের বশ্যতার কোনো দাবি উঠবে না, যতক্ষণ না তাঁর নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্য তুলে ধরতে ইস্যু করা না হয়। তাই শাসক যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাহলে সে আনুগত্য পাবার কোনো অধিকার রাখে না; যদি সে অবিসংবাদিতরূপে যা নিষিদ্ধ বলে মানা হয়, তার অনুমোদন দেয়। যেমন ব্যাভিচার, মদপান, ইসলামপ্রদত্ত দন্ড পরিত্যাগ, ইসলামি শরিয়ার দেওয়া প্রাণদন্ডরোধ এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তার অনুমোদন দেওয়া। এ ধরনের শাসককে একজন অবিশ্বাসী ও নিন্দিত ধর্মত্যাগী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। তদনুসারে, মুসলিমদের ওপর এ সব ধর্মত্যাগী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন মাত্রার দ্রোহ হলো কমপক্ষে তার সেইসব নির্দেশ অমান্য করা, যা ইসলামি শরিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সপ্তমত, ইসলামি শরিয়ার বিধান নিষ্কলুষ এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই মুসলিমদের জন্য এটা নিষিদ্ধ যে, শরিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করবে, এবং কিছু বাদ দিবে। এর ওপর দলিল সরবরাহ করে উপরে আমরা তা প্রমাণ করেছি। এ সব হলো ইসলামি শরিয়ার কিছু বিষয় যা দেখানো হলো এবং কুরআন ও হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। যা একজন বিশ্বাসী মুসলিমের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছে। এটা হলো একটা উদাহরণ, যা প্রত্যেক মুসলমানের পালন করা এবং তার ওপর আমল করা উচিৎ। সাধারণ আইন যা প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস ও ধর্মকে রক্ষা করতে প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তাতে যখন সেসব ধারা সংযোজন করা হলো, যা ইসলামি শরিয়ার মূলনীতির সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং মানুষকে ধর্মচ্ছুত করে তখন তা প্রকারান্তরে ধর্মের অবমাননা করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শরিয়ার জ্ঞান

মুসলিমদের শরিয়া-জ্ঞান

মুসলিমরা নিজেদের শরিয়ার ওপর যে জ্ঞান রাখে, সেটা তাদের পরিস্থিতি ও শিক্ষার অনুপাতে ভিন্ন হয়। শিক্ষার অনুপাতে তাদের তিনটি দলে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম দল হলো অশিক্ষিত শ্রেণী। দ্বিতীয় দল হলো ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। তৃতীয় দল হলো ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। আমরা প্রতিটি শ্রেণী নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করবো।

অশিক্ষিত শ্রেণী

এই শ্রেণীর লোকেরা নিরক্ষর। অশিক্ষিত। ক্ষেত্রবিশেষে এরা কিঞ্চিৎ পড়াশোনা করেছে। এদের সামনে যখন শরিয়ার কোনো বিষয় উপস্থাপন করা হয়, তখন এরা স্বতন্ত্র্যভাবে তা বুঝতে পারে না। ফলে সে বিষয়ে সঠিক মতামত দিতে এরা অসমর্থ। এই শ্রেণীর লোকদের ইসলামি শরিয়ার ওপর তেমন কোনো জ্ঞান নেই। একমাত্র সমষ্টিগত কিছু ইবাদতের ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা ছাড়া। এরা শরিয়া বলতে তা-ই পেয়েছে, যা তাদের পিতা ও পূর্বসুরী, পরিচিত ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক নেতাদের অনুসরণের মাধ্যমে পেয়েছে। এ রকম খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন যে, এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কেউ তার নিজস্ব ইলমের ওপর আস্থা রেখে ও ব্যক্তিগত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ইবাদত করছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অধিকাংশ মুসলমানকেই এই দলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। সম্ভবত পৃথিবীর ৮০ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যাই এই দলে পড়বে। এই দলের লোকেরা ব্যাপকভাবে শিক্ষিত শ্রেণীর দেওয়া গতিপথে প্রভাবিত। ইসলামি আইনে শিক্ষিত হোক, বা পাশ্চাত্যের আইনের শিক্ষিত হোক, এসব মানুষ শিক্ষিত শ্রেণীকে অনুসরণ করে। যাইহোক, ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলামি শিক্ষিতদের কথা শুনতে মানুষ বেশি আগ্রহী। যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ে তাদের জ্ঞান অন্যদের চেয়ে বেশি হওয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু মানুষ যখন এদের কাছে গিয়ে যুগজিজ্ঞাসার জবাব পায়না, তখন তারা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারস্থ হয়, তাদের অনুসরণ করে।

মুসলিম আইনবিদদের জন্য এটা যুক্তিযুক্ত ছিলো যে, তারা এই শ্রেণীর লোকদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করবেন। জনসাধারণদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি করবেন, যে, জাগতিক সকল আশয়-বিষয়েও ইসলাম জড়িত। তাদের বিশ্বাস কখনো পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না তারা সকল কাজে ইসলামকে গ্রহণ না করে, এবং ইসলামি শরিয়া মতো না চলে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বেশিরভাগ মুসলিম দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তাদের বিশাল অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে উদাসীন। তারা এদেরকে মূর্খতার মধ্যে ছেড়ে দেয়। আর অশিক্ষিত জনসাধারণ মনে করে, তারা সঠিক পথ অনুসরণ করছে। কিন্তু সত্য হলো, তারা বিপথে ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছে। আসলে সাধারণ মানুষ ভুলের মধ্যে পড়ে আছে শুধু ইসলামি শিক্ষার দায়িত্বশীলদের নির্লিপ্ততার কারণে। তাদের অবহেলা প্রকারান্তরে এই মিশন সফলে সমর্থন যোগাচ্ছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী

মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ শিক্ষিত জনগোষ্ঠি এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশিরভাগই মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এই দলে আছেন বিচারক ও আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদগণ।

এই দলের মানুষেরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না। তাদের গড়পড়তা অবস্থা অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের মতো, যারা ধর্ম সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল থেকে জেনেছে। এদের অধিকাংশই ইসলাম ও ইসলামি শরিয়ার চেয়ে গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক কাহিনী ও আচার সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল।

এই দলের খুব কম লোকেরই ইসলামি শরিয়া বা অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে স্বতন্ত্র পড়াশোনা আছে। এমনকি যারা পড়াশোনা করেছে, তাদের সংখ্যাও খুব কম।

তবে তাদের এই অধ্যয়ন খুবই সীমিত এবং ভাসা ভাসা। এ জন্য এই দলের মানুষ থেকে কদাচিৎ এক-দুইজনকে হঠাৎ মেলে, যারা ইসলামের আসল চেতনা বুঝতে পেরেছে। অথবা ইসলামি শরিয়ার মৌলিক নীতির ব্যাপারে ভালো উপলব্ধি আছে।

ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা, যাদের ইসলাম ও শরিয়ার জ্ঞান অতি সামান্য, তারা প্রত্যেক দেশেই ইসলামের ওপর কর্তৃত্ব করতে এবং ভাগ্যনির্দেশ করতে প্রয়াস চালায়। এইসব লোকই বাহ্যত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে মুসলিম দেশ ও ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে।

সত্যিকার অর্থে আমাদের স্বীকার করতে হবে, এইসব লোকদের বেশিরভাগ যদিও ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে মূর্খ, তবুও তারা ধর্মের প্রতি কিছুটা হলেও অনুগত। অন্তরে তারা বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের সর্বোচ্চ জানা অনুযায়ী ইবাদত করে। তবে এও সত্য, এরা নিজেদের ইসলামি জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও করে না।

কোনো বিষয়ে ইসলামি বিধিবিধানের বইয়ের সহায়তাও নেয় না। সম্ভবত এটা এ জন্য যে, তাদের জন্য এ সব বইয়ের পড়াশোনা ও গবেষণা কঠিন। কারণ তাদের তো ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে কোনো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নেই। এ সব বই হাজার বছর পূর্বে সে সময়কার লেখকেরা তাদের রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী লিখে গেছেন। এ সব কিতাবে রেফারেন্স উল্লেখের জন্য কোনো সূচিপত্র নেই। এটা বিরক্তিকর বটে, যখন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় পুনর্পাঠ করতে হয়। অথবা কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পাঠককে বিষয়টি আগাগোড়া পড়তে হয়। যতক্ষণ খুঁজে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায় পাঠ করতে হয়। ইতিমধ্যে পাঠক হয়তো আশাও ছেড়ে দিবে তার কাঙ্খিত উত্তরটি খুঁজে পাওয়ার। যদি না সে অপ্রত্যাশিতভাবে তা পেয়ে যায়। পাঠক হয়তো এ সব বই শেলফে তুলে রাখবে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে অপারগ হবে। ফলে বিষয়টির মৌলিক নীতি ও প্রায়োগিক আইনি পরিভাষা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা থেকেই যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেককেই জানি, যারা ইসলামি শরিয়া পাঠ করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন; কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তারা মূল পাঠ ও উক্তি, মার্জিন ও ব্যাখ্যার মধ্যে খেই হারিয়েছেন। তারা যদি আধুনিক ধাঁচে লিখিত বই পেতেন, তাহলে নিজেদের উপকৃত করতে পারতেন।

মাঝে মাঝে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর লোকজন ইসলামি শরিয়া নিয়ে অবাস্তব কিছু ধৃষ্টতা দেখায়। এবং এটা দেখিয়ে তারা বেশ আমোদিত হয়। মাঝেমধ্যে তারা খুবই হাস্যকর কিছু কথা বলে। তারা বলে, সরকার এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ বলে, ইসলাম একটি ধর্ম এবং রাষ্ট্রও বটে। কিন্তু ইসলামি শরিয়া বর্তমান সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়। কেননা, এর বিশেষ কিছু বিধান ক্ষণস্থায়ী হিসেবে এসেছিলো। এ জন্য তা বর্তমান সময়ে প্রয়োগ করা যাবে না।

এদের মধ্যে আরেক দল আছে, যারা স্বীকার করে যে, ইসলামি শরিয়া প্রকৃতপক্ষে আমাদের সময়ের জন্য মানানসই। এর অনুশাসন চিরস্থায়ী। তারপরও কিছু জুডিশিয়াল সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা ঠিক হবে না, যদি এটা বিদেশী বন্ধুদের শত্রুতে পরিণত করে। কিছু ধান্ধাবাজ লোক অভিযোগ করে, ইসলামি আইনে কুরআন ও হাদিসের চেয়ে ইসলামি আইনবিদদের মতামত বেশি এসেছে। এ ধরনের অভিযোগ সস্তা ও অমূলক। যারা ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে মূর্খ, তারাই এ সব বলে। তাদের এ সব কথা তাদের মূর্খতাকেই স্পষ্ট করে দেয়। এ সব কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা নিছক প্রমাণহীন অভিযোগ।

তাদের মধ্য থেকে এইসব গাধামো যুক্তি ও অভিযোগ বেরিয়ে আসার কারণ দু'টি। প্রথমত, ইসলামি শরিয়ার ওপর তাদের মূর্খতা। দ্বিতীয়ত, তাদের ওপর ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব। ইসলামি শরিয়ার ওপর মানব-তৈরি আইনের প্রয়োগের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আত্মগরিমা ও ভ্রান্ত ধারণা ও খোঁড়া যুক্তি এবং ব্যাখ্যার মধ্যে বড়ধরনের অসংগতি ছাড়া কিছুই না। কেননা, এক বলয় থেকে যা স্পষ্ট হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, অন্য বলয় থেকে তাতে সন্দিহান হওয়া বৈধতার কথা বলে। আমরা এখন এ সব অভিযোগ খন্ডন করার চেষ্টা করবো। এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা সমালোচনা করবো।

প্রথম আপত্তি

ইসলাম ও রাজনীতি

যারা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন, ইসলাম হলো নিছক একটা ধর্ম। সরকার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে এই ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কুরআন এবং হাদীসের কোথায় আপনি এমন কথা পেলেন? তারা হতবাক হবে। কোনো উত্তর দিতে পারবে না।

কারণ, এইসব যুক্তির পক্ষে তারা ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে প্রমাণ দিতে পারবে, যেহেতু তারা ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তারা শিখেছে, গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্যই দূরত্ব থাকতে হবে। একটি থেকে অন্যটি পৃথক হতে হবে। তারা ইউরোপীয় শিক্ষা দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, তারা বিশ্বাস করে, যেকোনো দেশের যেকোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে একমাত্র ইউরোপীয় আদর্শই গ্রহণযোগ্য সমাধান। অফসোস, তারা যদি তাদের বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতো, তাহলে বুঝতে পারতো, ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতিসহ মানুষের তৈরি যতো আইন আছে, তা কখনো প্রাধান্য পেতে পারে না। একমাত্র ইসলামি মতবাদকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ। যদি ইসলামের এই মতবাদ ধর্ম ও বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, তখনই এ সব লোকের অভিযোগ সমর্থন করা যায়।

এখন যদি এই মতবাদ ধর্ম ও সংসারে যোগাযোগ ঘটায়, ইসলামের সাথে সামরিক ডিফেন্সের সংযোগ ঘটায় এবং মসজিদগুলোকে সরকারি দপ্তর গণ্য করে, তাহলে তাদের অভিযোগ মিথ্যা ও বাজে প্রতারণা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

কয়েক বছর পূর্বে কয়েকজন যুবকের সাথে আমার দেখা। যারা তাদের আইনি পড়াশোনা মিশর থেকে শেষ করেছে। আমরা ইসলাম এবং শরিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি আবিষ্কার করলাম, তারা মনে করে, সরকার ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইসলামের কিছুই করার নেই। আমি তাদের ভর্ৎসনা করি। তারা আইনের ছাত্র হয়েও কোনো প্রমাণ ছাড়াই ইসলামি শরিয়া নিয়ে এমন মনোভাব পোষণ করে! যুক্তিতর্কে তাদের একজন বললো, 'আপনি কেন কুরআন থেকে আমাদের কোনো বিধান এনে দেখান না যে, ইসলাম রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয় এক সঙ্গে ধারন করে।' আমি বুঝতে পারলাম, সে কোথায় নিশানা করেছে। আমি বললাম, 'যদি সুন্নাহ থেকে কোনো বিধান এনে দিই, তুমি খুশি হবে?' সে বললো, 'না, ইসলামের সংবিধান হলো কুরআন।'

আমি তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাদের মতামতও একই। অবাক হলাম এই ভেবে, যে, এই ছেলেরা কুরআনের ওপর গভীর বিশ্বাস রাখে, অথচ তার বিষয়বস্তুর ওপর তারা নির্লজ্জভাবে মূর্খ। তাদের জন্য আমার দুঃখ হলো।

মূলত কুরআনের ব্যাপারে তাদের এই অজ্ঞতা তাদেরকে স্পষ্ট দু'টি নীতি অস্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। প্রথমত, ইসলাম জীবনের একটি সমান দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আচরণ করে। দ্বিতীয়ত, রাসুলের সুন্নাহ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কুরআনের মতো আরোপিত।

এই মুসলিম তরুণরা সচেতন ছিলো না যে, কুরআনে খুনী, বিদ্রোহী, চোর এবং কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে কী শাস্তি উচ্চারিত হয়েছে। বিধান হিসাবে শর্ত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي

হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৮) আল্লাহ

আরও বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ

কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করে ফেললে সেটা ভিন্ন; কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাসমুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। (সুরা নিসা, আয়াত ৯২)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৩)

- السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

চোর পুরুষ কিংবা নারী হোক, তাদের হাত কেটে দাও। (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৮)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সুরা নূর, আয়াত ২)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ রটায় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (সুরা নূর, আয়াত ৪)

তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে নিষিদ্ধ করে এবং অপরাধের সাজা নির্ধারণ করে কুরআনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন ধর্মত্যাগীর ব্যাপারে, প্রতারণা ও কুৎসা রটনার ব্যাপারে, ইত্যাদি।

এভাবে কুরআনে নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধকে নিষিদ্ধ করে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে তা দন্ডনীয় করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম কাজ হলো অপরাধ ও তার সাজার বিধান দেওয়া। কিন্তু এটাকে অনেকেই ধর্মীয় বিষয় হিসেবে মানতে চান না।

ইসলাম যদি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বিষয় একত্রিত না করতো, তাহলে কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াত থাকতো না। কুরআন যদি মুসলমানদের ওপর এ সব বিধান গ্রহণ করা এবং কার্যকর করাকে অবশ্যপালনীয় করে থাকে, তাহলে কুরআন এটাও বলে যে, এ সব আয়াত কার্যকর ও প্রয়োগ করতে এমন সরকার ও রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, যারা এই বিধান কার্যকর করবে। যা এ সব কাজকে তার অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করবে।

তাছাড়া কুরআনের দাবি, সরকারের বিষয়-আশয় অবশ্যই পরামর্শের আওতাধীন। আল্লাহ সেসব লোকদের বিশ্বাসী হিসেবে বর্ণনা করেন

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُم

যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে। (সুরা আশ শূরা, আয়াত ৩৮)

আল্লাহর নির্দেশ শাসককে মানুষের কথা শুনতে হবে। তিনি বলেন:

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯)

ইসলাম যদি রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করতো, তাহলে সরকারের সৃষ্ট সংকট ও কর্তব্যের ব্যাপারে এতো বিশদ আলোচনা করতো না। কুরআনের দাবি হলো, শাসনের মানদন্ড হবে ন্যায়বিচার ও স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার প্রাপকদেরকে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। (সুরা নিসা, আয়াত ৫৮)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি হলো, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম রাষ্ট্র ও ধর্ম দু'টির সমন্বয় ঘটায়।

ইসলাম হুকুম দেয়, রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলাম যা প্রকাশ করেছে, তদনুসারে শাসন করবে। তাছাড়া কুরআন বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেয়, তারা অন্যদের সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল মানুষ হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৪)

সৎকর্ম মানে কী? এটা হচ্ছে সেই সকল বিষয়, যা কিছু ইসলামি শরিয়া দাবি করে। আর অসৎকর্ম হচ্ছে সেই সকল বিষয়, যা ইসলামি শরিয়া নিষিদ্ধ করে। এটা যদি বাধ্যবাধকতা হয় যে, মুসলিমদের মধ্যে একটি দলকে একান্তভাবে নিয়োগ করা হবে, যারা ইসলামি আইন বলবত করতে পরামর্শ দিবে। এটা করতে হলে রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলামি হতে হবে। নতুবা এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কার্যকর করা যাবে না। তাই কুরআন ধর্মীয় ও সাংসারিক বিষয়কে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে।

আমরা ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়কে একত্রকারী কুরআনের একক আয়াত পাই। এ ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত আয়াতও আছে। যেমন সুরা আনআমের ১৫১ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا - وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - وَلَا تَقْتُلُوْ أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقَ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ - وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

বলো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, এসো, তোমাদের তা পড়ে শুনাই। তা হলো এই: 'তোমরা তাঁর সঙ্গে কোনো শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যা হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি যে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেন তা অনুধাবন কর। (সুরা আনআম, আয়াত ১৫১)

এই আয়াত নিষিদ্ধ করেছে, বহু ঈশ্বরবাদ, পিতামাতার অবাধ্যতা, মানুষ হত্যা, প্রকাশ্য কিংবা গোপনে অশ্লীলতা এবং অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী বল্লাহীন জীবনযাপন। সন্দেহাতীতভাবে এ সব জাগতিক ও নৈতিক বিষয়ের মিশ্রণ। রাষ্ট্রের ওপর কুরআনের দাবি হলো, রাষ্ট্র ঐশী বাণীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। যা ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বুনিয়াদের ওপর একত্রিত রাখবে। আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَتَوُا الزَّكَاةَ وَ اَمَرُوْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্ম নিষেধ করবে। (সুরা হজ্জ, আয়াত ৪১)

এই উদ্ধৃতি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আদর্শ রাষ্ট্র হলো সেটা, যা তার নাগরিককে ইবাদত করতে, দান করতে নির্দেশ দেয়। এর সাথে আল্লাহ যা প্রতিষ্ঠার হুকুম করেছেন এবং যা করতে বারণ করেছেন, তা মেনে চলে। এই বিধান প্রয়োগ করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের ভিত্তির ওপর রাজনৈতিক বিষয় ও রাষ্ট্রীয় বিধান এক সাথে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কুরআনে অসংখ্য বিধান আছে, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা যাবে না। যাতে আলোচনা রয়েছে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব, শান্তি ও যুদ্ধ, চুক্তি ও পরিষদ, ব্যবসাবাণিজ্য, সিভিল রাইট এন্ড অবলিগেশন, আরও অনেক কিছু। যেমন, গরিবদের ফায়দার জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর একটি অধিকার- শুল্ক বা ট্যাক্স ধার্য করেছে। অনাথদের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নিঃস্ব ও মুসাফিরদের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। এই বিধান ঐশী আইন, যা সকল বিষয়ের জন্য। যার সঙ্গে আমাদের সামাজিক বিশ্বাস ও ইবাদতের সম্পর্ক। এটা পার্থিব বিষয়ের সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে এবং শাসক ও শাসিতকে পথনির্দেশ করতে দুটি বিষয়কেই ইসলাম ব্যবহার করে। জাগতিক বিষয়াবলী এবং ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক কুরআনে এতোটাই স্পষ্ট যে, এটা নির্বিঘ্নে বলা যায়, ইসলামে ধর্ম হলো রাষ্ট্রের একটি প্রকাশ এবং রাষ্ট্র হলো ধর্মেরই একটি প্রকাশ। যাইহোক, সেসব মুসলিম যুবক, যারা কুরআনের ওপর বিশ্বাস রাখে, তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয় যে, কুরআনের নির্দেশ হলো রাসুলের সুন্নাহ অর্থাৎ তাঁর কথা ও কাজ হলো আইন, যা সকল মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। কুরআন নির্দেশ দেয়, এ সব কথা ও কাজের সম্মতি মান্য করতে। এমনকি যদি এই অবস্থান নিশ্চিত করে কোনো আয়াত নাও থাকতো, তবুও মুসলিমদের গোটা জীবনের জন্য সুন্নাহকে পবিত্র আইন হিসেবে প্রয়োগ করতে হতো। সে সশ্রদ্ধ বিবেচনা থেকে যে, রাসুল সাঃ কখনো তার নিজের প্রবৃত্তি ও মানবিক আত্মগরিমা থেকে কথা বলেন না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না। এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সুরা আন-নাজম আয়াত ৩-৪)

কুরআনে অনেক আয়াত আছে, যা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য এবং তার ফায়সালাকে অবশ্যপালনীয় করেছে।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের, এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। (সুরা নিসা, আয়াত ৫৯)

- مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ الله

কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সুরা নিসা, আয়াত ৮০)

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله

বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ৩১)

- وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো। (সুরা হাশর, আয়াত ৭)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। (সুরা নিসা, আয়াত ৬৫)

দ্বিতীয় আপত্তি

আধুনিকতার সাথে শরিয়া বেমানান

ইউরোপীয় শিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়শই বক্তব্য দেন যে, আধুনিক যুগের সঙ্গে শরিয়া মানানসই নয়। কিন্তু তারা তাদের এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ দিতে পারেন না। কারণও হাজির করেন না। তারা যা বলতে চান, তা হলো, বিশেষ কিছু নীতি বা নীতিসমূহ আমাদের এই যুগে প্রয়োগযোগ্য নয়। তাদের এ সব দাবি যদি কোনো মূল্য রাখতো, তাহলে তাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতো। তাদের দাবির ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তারা তো যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই তুড়ি মেরে বলে, পুরো ইসলামি শরিয়াই বর্তমান সময়ে অচল। এটা কোনো বক্তব্য হলো! যুক্তি হলো!

তাদের বক্তব্য তো বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদের নিজেদের মতোই অচল। ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে তাদের এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ শিক্ষিতদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিটিরও স্বীকার করবে যে, তাদের এই মত সম্পূর্ণ মূর্খতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শরিয়ার উপযোগিতা নির্ণীত হওয়া উচিৎ এর নীতির স্বকীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে। ইসলামি শরিয়ার একটি নীতিও এমন নেই, যাকে অগ্রহণযোগ্য ও অনুপোযুক্ত হিসেবে প্রতিপন্ন করা যাবে। এমনকি এর ক্ষুদ্র একটি নীতির ব্যাপারেও এই প্রমাণ দেওয়া যাবে না। শরিয়ার কিছু স্পষ্ট নীতি আছে, যার ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় মুসলিমরা নিজেদের মূর্খতার কারণে বিচ্যুতির অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছে। ইসলামি শরিয়া সব মানুষের অধিকার শর্তহীন সমান করেছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন। (সুরা হুজুরাত, আয়াত-১৩)

রাসূল (সা.) বলেছেন:

الناس سواسية كاسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي الا با التقوى

সকল মানুষ সমান চিরুনীর দানার মতো। কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের প্রাধান্য নেই শুধুমাত্র ধার্মিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা ব্যতীত।

ইসলামের সমতার এই বিধান তেরশত বছর পূর্বে মানুষের মধ্যে এসেছিলো। অপরদিকে মানুষের তৈরি আইন, যা নিয়ে আমাদের নাদান বন্ধুরা গর্ব করে, তা এমন সমতাকে স্বীকার করে না।
যে আইন এসেছে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। এমনকি আজও বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা এই নীতি প্রয়োগের ওপর বলহীন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়।
তাছাড়া স্বাধীনতার অসামান্য নীতি ইসলামি শরিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠিত। এর আওতায়, চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভালোভাবে স্বীকৃত। এমনকি কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে:

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

বলো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ্য কর। (সূরা ইউনুস, আয়াত-১০১)

وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا -

যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৬৯)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দ্বীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নাই। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৫৬)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْن إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম। (সুরা আল ইমরান, আয়াত-১০৪)

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে মানব-তৈরি আইনে স্বাধীনতার নীতি তার তিনটি বিভাগসহ স্বীকৃত ছিলো না। যদিও মূর্খরা ইসলামি শরিয়া যে এ সব নজির স্থাপন করেছে, তা অস্বীকার করে। তারা এ সব আইনকে ইউরোপীয় আইনের বৈশিষ্ট্য বলে চালিয়ে দেয়।

'অকাট্য ন্যায়বিচার' ইসলামি শরিয়ার অন্যতম একটি মৌলিক নীতি। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। (সুরা নিসা, আয়াত-৫৮)

وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। (সুরা মায়িদা, আয়াত-৮)

এই নীতিও ইসলামি শরিয়ায় তার শুরুর সময় থেকে ছিলো, যা আটারো শতকের শেষ দশক পর্যন্তও মানব তৈরি আইনে স্বীকৃত ছিলো না।

এই হলো, তিনটি প্রধান নীতি, যার উপর মানব তৈরি আইন প্রতিষ্ঠিত। আর শরিয়া এগারো শতকেরও বেশি সময় পূর্বে যা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাহলে তারা কিভাবে বলে, মানব-তৈরি আইন আধুনিক যুগের জন্য উপযুক্ত আর ইসলামি শরিয়া সমান কাঠামো ও নীতির প্রবক্তা হয়েও উপযুক্ত নয়?

অন্য দিকে ওহী নাজিলের প্রারম্ভ থেকেই ইসলাম পারস্পরিক পরামর্শ নীতি প্রয়োগের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (সুরা শুরা, আয়াত-৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। (সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৫৯)

অতএব ইসলামি শরিয়া এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মানব-তৈরি আইনের চেয়ে প্রায় এগারো শতক অগ্রবর্তী। শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের ব্যাপার ছাড়া। ইংল্যান্ডে তা ইসলামের দশ শতক পর স্বীকৃতি পায়। তাই ইউরোপীয় আইন এমন কোনো নতুনত্ব প্রবর্তন করেনি, (যা পারস্পরিক পরামর্শের একটি প্রয়োগিক নীতি) যখন তারা সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব করে। তারা কেবল তাদের আবেগ পেয়েছে, যেখানে ইসলামি শরিয়া উপসংহার টেনেছে।

এ ছাড়া ইসলাম তার প্রাথমিক রেভ্যুলেশন থেকেই রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেছে। তার বৈশিষ্ট্য বলে, তার দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং ভুল পদক্ষেপের জন্য দায়বদ্ধ হবে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আইনের চোখে শাসক ও জনগণ দু'জনই সমান। কারণ শাসক তার কর্মে নিয়ন্ত্রিত ওই বিধানের দ্বারা এবং জনগণের উপর তাদের অন্যায় কোনো সুবিধা নেই। সাম্যের বিধান অনুযায়ী এক কাতারে দু'জনেরই অবস্থান।

ইসলামি শরিয়া এইসব বিধানের প্রবর্তন করে ইউরোপীয় আইনের এগারো শতক পূর্বে। এই শরিয়া বর্তমান যুগের সাথে বেমানান, এটা কিভাবে অভিযুক্ত হতে পারে? তাছাড়া ইসলামি শরিয়া মদ খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে এবং বিবাহবিচ্ছেদের অনুমোদন করেছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা মায়িদা, আয়াত-৯০)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। (সুরা বাকারা, আয়াত-২২৯)

মানব-তৈরি আইন বর্তমান ক্রমোন্নতির সময় ছাড়া কখনো বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি এবং মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধের মধ্যে যে লাভ তার স্বীকৃতি দেয়নি। এখন নতুন আইনে কিছু কিছু মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। আর অন্যগুলোর উপর আংশিক বিধিনিষেধ আরোপ করে। মজার ব্যাপার হলো, শরিয়া থেকে সংগৃহীত এ সব আইন উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর স্বয়ং শরিয়াকে অনুপোযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

ইসলামি শরিয়া হলো আইনের সর্বপ্রথম পদ্ধতি, যা বাস্তবেই সামাজিক সহযোগিতার ধারণা এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। (সুরা মায়িদা, আয়াত-২)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে 'যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের'। (সুরা মা'আরিজ, আয়াত-২৪,২৫)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকাহ' গ্রহণ করবে। এরপর তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। (সুরা তাওবা, আয়াত-১০৩)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, বন্দীমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা তাওবা, আয়াত-৬০।)

مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের স্বজনগণের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। (সুরা হাশর, আয়াত-৭)

উপরে উল্লিখিত দু'টি ধারণা আমাদের শরিয়া দ্বারা তেরশত বছর পূর্ব থেকে পরিচিত।যখন অমুসলিম বিশ্ব বর্তমান শতকের পূর্বে এ ব্যাপারে সামান্য সচেতন ছিলো। আর এখন তারা তন্মধ্যে আংশিক কিছু প্রয়োগ করছে।

ইসলামি শরিয়া একনায়কতন্ত্রের চর্চা, রাষ্ট্রীয় শোষণ, ঘুষ এবং দুর্নীতিকে নিষিদ্ধ করে। রাসুল (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই কুক্ষিগতকারী একজন অপরাধী। আর আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের হাতে তুলে দিও না। (সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৮)

এসব মহৎ ধারণা মানব-তৈরি আইনে স্বীকৃত ছিল না। দীর্ঘকাল পরে তা সংযোজিত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়া জোরালোভাবে নিষিদ্ধ করে গুরুতর পাপের দালালি, নির্লজ্জতা এবং অনৈতিকতাকে। তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক। নিষিদ্ধ করে পাপ ও নিগ্রহতাকে। আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ -

বলো,নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা।(সুরা আ'রাফ, আয়াত-৩৩)

একই সময়ে শরিয়া ভালো কাজে প্রেরণা দানকে অনুমোদন করে এবং যা সঠিক, তা বাস্তবায়ন করতে বলে ও যা মন্দ, তা নিষিদ্ধ করে।

وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম। (সুরা আল ইমরান, আয়াত-১০৪)

এর মতো আরো অনেক নীতি ইসলামি শরিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে বাস্তবরূপে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এমন সঠিক নমুনা যা মানব জাতি খুঁজছে এবং তা অর্জন করার স্বপ্ন দেখছে। শরিয়ার একটি ধারা যার নীতি যথার্থ আদর্শ উপস্থাপন করে এবং যা সমকালীন মানবজাতি আন্তরিকভাবে খুঁজে ফিরছে, তা কিভাবে আমাদের যুগের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হবে? আমরা যদি মানবিক, সামাজিক এবং আইনি রীতিনীতির দিকে তাকাই, যা আমাদের যুগকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং যার জন্য মানুষ খুব গর্বিত, তাহলে আমরা দেখতে পাই, এসব নীতি ইসলামি শরিয়ায় সর্বোচ্চ সম্ভবপর পন্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামি শরিয়া বর্তমান সময়ের জন্য অনুপোযুক্ত, এই অভিযোগ করা চরম এক ধৃষ্টতা। এই অভিযোগ আসে চরম মূর্খতা ও অন্ধতার কারণে। এর স্বপক্ষে প্রকৃতপক্ষে কোনো দলিল নেই। এ ধরণের অভিযোগের একমাত্র কারণ হতে পারে যে, তাদের শিখানো হয়েছে যে, পুরনো আইন ও বিধান অধুনালুপ্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা আমাদের আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এই অস্পষ্ট বর্ণনাকে সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তা ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারেও প্রযোজ্য মনে করছে। তারা শরিয়াকে বিবেচনা করছে একটি 'পুরনো' আইন এবং 'পুরনো' বিধান হিসেবে। তারা কখনও ইসলামি শরিয়া ও মানব-তৈরি আইনের মধ্যকার বাস্তবিক ব্যবধানের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি।

তৃতীয় আপত্তি

শরিয়ার কিছু বিধান অস্থায়ী

ইউরোপীয় শিক্ষিতদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে, যাদের ধারণা, বর্তমান যুগের প্রয়োজন পুরণে ইসলামি শরিয়া যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু এর কিছু বিধান মূলত সাময়িকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দেওয়া হয়েছিলো। এ কথার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু বিধানের কথা বুঝায়। বিশেষকরে যেসব দন্ডের সাথে মানব-তৈরি আইনের কোনো সামঞ্জস্য নেই। যেমন, পাথর নিক্ষেপে হত্যা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে না যে, এ ধরনের ইসলামি আইন সেকেলে। সর্বোপরি তারা যা উপস্থাপন করে, তা সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। এর একমাত্র কারণ হলো, তারা তাদের আইনের মধ্যে সমান কোনো আইন পায় না। তাই তারা চেষ্টা করে এ সব অমূলক অভিযোগ দ্বারা ইসলামি আইনের কর্তৃত্বকে খর্ব এবং ব্যর্থ করতে। এখন যদি মানব-তৈরি আইন তুলনামূলক দন্ড অন্তর্ভুক্ত করতো, তাহলে এইসব লোক তাদের চিন্তার পরিবর্তন করতো এবং ঘোষণা দিতো যে ইসলামি আইনের বিধান চিরস্থায়ী। এসব মুসলিম যদি নিজেদের ধর্ম ইসলামকে যথাযথভাবে বুঝতে পারতো, তাহলে তারা দেখতো যে, ইসলামের বিধান হলো চিরস্থায়ী। এটা কোনো অস্থায়ী বিষয় নয়। যা কিছু রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় রহিত করা হয়নি, তা কেয়ামত পর্যন্ত আর রহিত করা সম্ভব নয়। রাসুলের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কুরআন প্রকাশ করে যে, এখন ইসলামের অবয়ব পূর্ণ হয়েছে। তার পরে আর এতে সংযোজন অথবা বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়িদা, আয়াত-৩)

আমরা যদি কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী বিধানের ধারণা গ্রহণ করি, তাহলে সমানভাবে তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হবে। ইসলামি শরিয়ার গোটা অবয়ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এর যেকোনো বিষয় বাস্তবায়নে ব্যক্তির অদ্ভুত সিদ্ধান্তের উপর চলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চতুর্থ আপত্তি

শরিয়ার কিছু বিধান বাস্তবায়নের অনুপযোগী

যারা তর্ক করেন যে, কিছু ইসলামি বিধান সমাজে প্রয়োগ করা উচিৎ হবে না, তাদের এই বক্তব্যে স্বয়ং তাদের ওই বিশ্বাস প্রায়োগিকভাবে চিরস্থায়ী হবে। যাইহোক, তাদের অভিমত হলো, নির্দিষ্ট কিছু দন্ডবিধি, যেমন, পাথর নিক্ষেপে হত্যা এবং হাত কাটা বর্তমান সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। কারণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দুর্বল। আর এ সব মুসলিম দেশে যেখানে কিছু বিদেশী লোক বসবাস করে এবং যারা এ সব দন্ডের অধীনে আসতে অস্বীকার করে। এ ছাড়া তাদের সরকার আপত্তি জানাবে, তাদের নাগরিকদের উপর এ সব আইন প্রয়োগ না করতে। কার্যত এরা বিদেশী শক্তির নিন্দার ভয়ে ইসলামি আইন প্রয়োগ করতে অনাগ্রহী। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে অসঙ্গত। আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِي ثَمَانًا قَلِيلًا - وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -

সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। (সুরা মায়িদা, আয়াত-৪৪)

এখানে কিছু মুসলিম আইনবিদদের অভিমতের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যারা ব্যভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অপরিহার্যভাবে পাথর মারা কিংবা হাত কাটার আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসেন নি। এই মত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ আমরা দেখিনা। তা সত্ত্বেও এটা অবশ্যই জোর দেওয়া উচিৎ যে, পাথর নিক্ষেপের দন্ড মূলত প্রতিকী। যেহেতু ইসলামের দাবি অনুযায়ী সাক্ষী দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। রাসুল (সা.) এবং খলিফাদের শাসনামলে সকল ব্যভিচারের সাজা সাব্যস্ত হয়েছে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। কিন্তু কখনও তা সাক্ষীর মাধ্যমে হয়নি। পরিস্কার স্বেচ্ছা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান দেওয়া যায়। অথবা চারজন সচ্ছরিত্র ব্যক্তি যারা সরাসরি যৌনক্রিয়া দেখেছেন, তাদের সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়। তবে সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার সাব্যস্ত করা খুবই দুরূহ। এই যুগে এটা নেহাত বিরল ঘটনা হবে যে, একজন বিশ্বাসী স্বেচ্ছায় তার ব্যভিচারের কথা স্বীকার করবে এবং জেদ করবে তার স্বীকারোক্তিতে, যাতে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

পঞ্চম আপত্তি

ইসলামি শরিয়া আইনবিদদের মতামতের উপর নির্ভরশীল

ইউরোপীয় শিক্ষিতদের মধ্যে একদল লোক আছে, যাদের বিশ্বাস, ইসলামি শরিয়া প্রাথমিকভাবে আইনবিদদের দ্বারা প্রণীত। যদি কেউ তাদের সামনে ইসলামের এমন এক থিউরি উপস্থাপন করে, যা পরবর্তীকাল পর্যন্ত জাগতিক আইনে অপরিচিত ছিলো। তখন তারা মুসলিম আইনবিদদের ব্যাপারে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা সপ্তম ও অষ্টম শতকে বিচারিক দক্ষতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, যেখানে অন্যান্য আইনবিদরা উনিশ ও বিশ শতকের পূর্বে পৌঁছতে পারেননি, কিংবা পৌঁছার কল্পনাও করেননি।

এ ধরনের চিন্তাভাবনার এক লোক একবার আমাকে বলে, সে মনে করে মুসলিম আইনবিদরা সুপারম্যান ছিলেন! কারণ, তারা মানুষের কল্পনাশক্তির তের শতক সমুখের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারতেন।

কিন্তু যারা মনে করেন, ইসলামি শরিয়া আইনবিদদের আবিস্কার, তারা নিঃসন্দেহে সেসব মানুষের মতো ভ্রান্তিতে আছেন, যারা বিশ্বাস করে, স্বয়ং আইনবিদরা মানুষের চিন্তাধারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন।

আসল কথা হলো, মুসলিম আইনবিদরা (তাদের অগাধ পান্ডিত্য ও প্রগাঢ় প্রতিফলন থাকার পরও) তাদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে কোনো নতুনত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। তাদের প্রখর চিন্তাশক্তির উপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তারা সাধারণ মানুষের মানদন্ডের উর্ধ্বে ছিলেন না। বিষয় হলো, তারা তাদের আয়ত্তের মধ্যে এমন এক পদ্ধতি পেয়েছিলেন, যা সর্বাঙ্গীন মূলনীতি ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ ছিলো। তারা এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন গভীরভাবে। এর তো বেশি কিছু তারা করেননি, যা যেকোনো আইনবিদ এবং প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি করার চেষ্টা করবে যে, সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রত্যেকটি ধারণাকে নির্ধারিত করে দেওয়া। তার সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং প্রত্যেক মূলনীতি যার সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত, তার অধীনে তা বিন্যাস করা। এখানে যদি কোন উদ্ভাবন কিংবা চিন্তার অগ্রগামীতা হয়ে থাকে, তাহলে তা ইসলামি শরিয়ারই উদ্ভাবন, যা স্বয়ং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশের অগ্রগামী ছিলো। ইসলামি শরিয়া; যা এসেছে মানবতাকে পথনির্দেশ করার অভিপ্রায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ হিসেবে। এসেছে উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার উচ্চশিখরে পৌঁছে দিতে। মুসলিম আইনজ্ঞরা সমতার অকাট্য ধারণা, অসীম স্বাধীনতা কিংবা ব্যাপক সুবিচার আবিস্কার করেননি। কিন্তু তারা তা বের করেছেন কুরআনের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ থেকে।

আমরা ইতিপূর্বে এরকম কিছু আয়াত পেশ করেছি। মনে করি না, সেসবের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। মুসলিম আইনবিদরা যখন বাণিজ্যিক ব্যাপারে সাক্ষী গ্রহণ করেছেন, তখন তারা সিভিল অবলিগেশন রিটের ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেননি। কিন্তু এ সব কুরআনের আয়াতে আরোপ করে দেওয়া হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الَّا تَكْتُبُوهَا -

হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান করো, তা তোমরা না লিখলেও কোন দোষ নাই। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮২)

মুসলিম আইনবিদরা নিজেরা সেই তত্ত্ব প্রবর্তন করেননি যে, ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যবে, যা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধার্য করা হয়েছে। অথবা ঋণগ্রহীতার অধিকারের সেই ধারণা, যাতে নির্দেশিত হয়েছে চুক্তির নিয়মাবলী; বরং তা প্রকাশিত হয়েছে কুরআনের আয়াতের দ্বারা। আল্লাহ বলেন-

وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا – فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ هُ بِالْعَدْلِ.

সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, এবং তার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮২)

তারা কোন সম্ভাব্য তত্ত্ব প্রণয়ন করেননি, যা আমরা 'পরিবর্তিত পরিস্থিতির তত্ত্ব' নামে জানি। তা আহরণ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত থেকে:

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। (সুরা হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন; তবে তোমরা নিরুপায় হলে, তা স্বতন্ত্র। (সুরা আনআম, আয়াত: ১১৯)

আইনবিদরা বাধ্যবাধকতা ও বলপ্রয়োগের কারণে যে দায়িত্বহীনতা তার তত্ত্ব আরোপ করে যাননি, কিন্তু কুরআন করেছে:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত। (সুরা নাহল, আয়াত ১০৬)

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ -

কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩)

রাসুল (সা.) বলেছেন:

رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

আমার উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত (অনিচ্ছাকৃত) ভুলের জন্য, বিস্মৃতির জন্য এবং যা করতে তারা বাধ্য ছিল।

আইনবিদরা তো সেসব লোক ছিলেন না, যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ এবং ঘুমন্তের দন্ডদান থেকে বাদ দেওয়ার তত্ত্বের জন্মদাতা। বরং এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো রাসুল (সা.) বাণীর দ্বারা:

رفع القلم عن ثلث، عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل

কলম (অর্থ্যাৎ রায়) তুলে নেওয়া হয়েছে তিনজনের জন্য: বাচ্চা বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, নিদ্রিত লোক জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ভালো হওয়া পর্যন্ত।

'ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি'র ধারাটিও আইনবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত নয়। এটা প্রতিষ্ঠিত কুরআন দ্বারা। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। (সুরা ফাতির, আয়াত: ১৮)

রাসুল (সা.) বলেছেন:

ولا يواخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه، وحيث يقول لابي رمثة وولده : انه لا يجنى ولا يجنى عليه .

ব্যক্তি কখনো তার পিতা অথবা ভাইয়ের অপরাধের কারণে নিন্দিত হতে পারে না। তিনি আবু রিমছা ও তার ছেলেকে বলেছেন, তোমাকে তার অপরাধে পাকড়াও করা হবে না, কিংবা তাকে তোমার অপরাধের কারণে।

মুসলিম আইনজ্ঞরা 'দুর্ঘটনাজনিত' ও 'পূর্বপরিকল্পিত' এই দু'টি বিধানের মধ্যে নিজেরা প্রভেদ করে দেননি। কিন্তু তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে

এক মু'মিন দাসমুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। (সুরা নিসা, আয়াত ৯২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৮)

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

এই ব্যাপারে কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। (সুরা আহযাব, আয়াত: ৫)

আমরা কদাচিৎ এমন কোনো থিউরী বা সাধারণ নীতি পাই, যা কুরআন অথবা সুন্নাহর বক্তব্য ছাড়া প্রতিষ্ঠিত। আইনবিদরা এ সব থিউরী ও মূলনীতির ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করেননি। এর শর্তাবলী যার আওতায় প্রযোজ্য, তা স্পষ্ট করেছেন এবং এর শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তারা অপরিবর্তনীয়ভাবে ইসলামি শরিয়ার কাঠামোর মধ্যে কাজ করে গেছেন এবং নিজেদের এর পদ্ধতি ও চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাছাড়া তারা শরিয়ার উপাদানসমূহ ও সিদ্ধান্তের সাথে প্রাথমিক বা আসল নীতির দিকে সম্পর্কিত করতে বড় ধরনের প্রচেষ্টা করেছেন। তারা সেসব নীতি ব্যাখ্যা করেছেন, যা তাতে প্রযোজ্য হয়। বিশেষ করে যেহেতু শরিয়া ঐসব সিদ্ধান্ত ও উপাদানসমূহকে সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির আওতায় ব্যবস্থাপনার জন্য খুঁটিনাটি বক্তব্য প্রদান করেনি।

এটাই হলো প্রকৃত সত্য ও বাস্তব সমাধান ওই দোষারোপের বিরুদ্ধে, যারা বলে ইসলামি শরিয়া হলো আইনবিদদের জালিয়াতি। কোনো সন্দেহ নেই, একটি গুরুতর ভুল ও একটি ভ্রমাত্মক ও অগ্রহণীয় তুলনা থেকে উৎপাদিত, যা ইসলামি বিধান ও গতানুগতিক আইনের মধ্যে করা হয়েছে। এটা শুধু পরবর্তীদের দ্বারা হয়েছে, যারা সাধারণ গতানুগতিক আইন খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করেছিলো। যা আরোপিত

নীতি ও কার্যকর আইন হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আইনবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিলো।

আমি আশা করবো এ সব ভদ্রলোকরা 'জাহিরিয়া' মতবাদের ব্যাপারে কিছু পড়াশোনা করবেন। এ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আইনবিদরা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা (ঐকমত্য) সংশ্লিষ্টতা ছাড়া অন্য কোন উৎসকে স্বীকৃতি দেন না। এমনকি তারা যেকোনো সাহাবীর উপমা, ব্যাখ্যা ও মতামতকে শরিয়ার উৎসের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি যদিও জাহেরিরা পরোক্ষভাবে উদ্ধৃত সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে, তবুও তারা কুরআন থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পায় এবং তাদের প্রত্যেকটি থিউরি ও প্রত্যেকটি নীতির সমর্থনে হাদীসও পায়, যা তারা গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার এ সব বন্ধুদের সন্তুষ্ট করতে এই ধারণা নিজেই যথেষ্ট। যাদের ইসলামি শরিয়া সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী

এই দলের লোকেরা হলো যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পেয়েছেন। তবে এরা সংখ্যায় নগন্য নয়, যদিও তারা ইউরোপীয় শিক্ষিতদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। তবে সাধারণ মুসলিমদের ওপর এই দলের অর্থাৎ ইসলামি শিক্ষিতদের বলিষ্ঠ প্রভাব আছে। বিশেষ করে ইসলামি বিষয়- আশয়ের ব্যাপারে। তবে এই দলের রাজনৈতিক কোনো ক্ষমতা বা প্রভাব নেই এবং তাদের নেতারা কদাচিৎ সরকারি কার্যাবলী গ্রহণ করেন। নতুবা তারা ধর্মপ্রচার করা এবং আদালতের সাধারণ অধিবেশনে একটি জুডিশিয়াল পদ পেয়ে থাকেন।

ইউরোপীয় আইন প্রবর্তনের আগে ইসলামি শিক্ষিতদের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু ইউরোপীয় আইন প্রবর্তনের ফলে নতুন পরিবেশে এই দল কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত তারা শাসনকার্য থেকে ছিটকে পড়ে। দীর্ঘদিন তারা এই মূল্যহীন পদমর্যাদায় থাকতে থাকতে একসময় নতুন 'সামাজিক মর্যাদা'র ওপর অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন পরিণতির জন্য অসন্তুষ্ট নন। এর মূল কারণ হলো, তাদের বিদ্রোহ করার অযোগ্যতা অথবা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের অক্ষমতা। এটা হয়েছে তাদের নীরব বশ্যতা স্বীকার এবং পরিবর্তনকে সাগ্রহে গ্রহণ করার কারণে। ইসলামি শিক্ষিতরা নিজেদেরকে ইসলামের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিবেচনা করেন এবং মুসলিমদের দ্বারাও তা বিবেচিত হন। যেহেতু তারা এর বিধিবিধানের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত থাকার কথা এবং নেতা হওয়ার কারণে ধর্মরক্ষায় তারা সর্বোচ্চ সক্ষম গোষ্ঠী। কারো কারো মতে, বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে এই দল ধর্মরক্ষায় একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার মূল কারণ হলো, ইউরোপীয় আইনের বহিরাক্রমণ, যা বর্তমানে ইসলামি দেশগুলোতে প্রচলিত। এটা ঘটেছে মুসলিম জেনারেশনের মধ্যে ইসলামি শিক্ষার জমাট অবস্থার কারণে। অবশেষে এমন অবস্থা এলো যে, মানুষ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যেমন দৈনন্দিন ইবাদত এবং ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছাড়া আর কিছুই জানতো না। অবস্থা এমন বেগতিক হতে থাকে যে মূর্খ লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, এরপর যে আইন বলবৎ ছিল তা ইসলামি আইন। আর শিক্ষিতরা বিশ্বাস করতো, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম মাত্র। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের উপযোগী কোনো কিছু তার মধ্যে নেই। ফলে সত্যের পথনির্দেশ করতে সেসব মুসলিম আইনবিদ ছাড়া ইসলাম সম্পর্কে জানে এমন কেউ বাকি রইল না।

মুসলিম শিক্ষাবিদরা যদি ইসলাম রক্ষা করতে বারকয়েক ব্যর্থও হন, যা অপ্রীতিকর; কিন্তু তা স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক ফলাফল বলা যায়। যা কোনো কলঙ্ক বয়ে আনে না। কিন্তু যা দুর্নাম বয়ে আনে তা হচ্ছে, সম্ভাব্য সব চেষ্টা প্রয়োগে অসফলতা এবং নিজেদের ধর্মের জন্য সময় উৎসর্গ ও সংগ্রামে ব্যর্থতা। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সকল চেষ্টাই করে গেছেন, যদিও পরিস্থিতি অনুকূল ছিলো না। সন্দেহ নেই, এখনও তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তারা কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের প্রত্যাশা তাদের অবিরাম সংগ্রাম বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হবে।

তবে মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে একটি প্রজন্ম রয়েছে, যারা খুব ভালো ইসলামি শিক্ষা পেয়েছে। যে তরুণেরা ইসলামের হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা তাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং তারা এটাকে শক্তভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। তাদের দুর্বলতা হচ্ছে, তারা তাদের পূর্বসূরীদের পথে হাঁটছেন। তাদের বেশিরভাগ সময় আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনে কিংবা বক্তব্য দিয়ে ব্যয় করছেন। তারা কি তাদের মুসলিম ভাইদের নিজেদের বাতিল হয়ে যাওয়া শরিয়া সম্পর্কে অবগত করেছেন। তারা কি সাবধান করেছেন মুসলিম ভাইদের বাহির থেকে আমদানী করা আইন সম্পর্কে, যা ইসলামের বিধান ও জুডিশিয়াল সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক? এটা করতে পারলে তাদের নিজেদের জন্য এবং নিজেদের ধর্মের অনেক সুফল বয়ে আনতো। তারা সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও অর্থহীন ধকল থেকে নিজেদের মুক্তি দিতে পারতেন।

নতুন প্রজন্ম ইসলাম প্রচারের যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে, তাতে হয়তো অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য কার্যকর হবে। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হয়েছে, তাদের বুঝাতে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। যারা জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং মুসলিম দেশগুলোর সরকারে প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের বোঝাতেও এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট নয়। মুসলিম শিক্ষাবিদদের পাশ্চাত্য চেতনায় বিশ্বাসী লোকদের বোঝাতে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিৎ এবং ইসলামি আইন সম্পর্কে তারা যা জানে না, তা তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। যদি কখনও এ সব লোকের চেতনা ইসলামে প্রশিক্ষিত হতো এবং ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মহিমা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হতো, তাহলে তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য রক্ষক এবং অধিবক্তা হয়ে যেতো। আমি দেখতে চাই, যারা ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছে তাদেরকে মুসলিম শিক্ষাবিদরা প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেকদিন বুঝাচ্ছেন।
তারা আলোচনা করছেন ইসলাম ও ইউরোপীয় আইনের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যের ব্যপ্তি নিয়ে এবং যারা অনৈসলামিক আইন প্রতিষ্ঠা করে, সেসব লোকদের প্রতি ইসলামের বিধান কী, সে ব্যাপারে। আমাদের অবশ্যই এটা ভুললে চলবে না যে, যারা ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছেন, তারা এখনো মুসলিম। যদিও তারা ইসলামের কিছু বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে যা জানে না, তা শিখতে তারা বন্ধুভাবাপন্ন।

আমি এটাও দেখতে চাই, যারা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের ইসলামি শরিয়া পড়তে সক্রিয় করছেন। এর প্রত্যাদেশ পরিচিত করাচ্ছেন। এর নীতি মতবাদ এবং মানব-তৈরি আইনের উপর এর উৎকর্ষতার ব্যাপারে নিশ্চিত করছেন। একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বোধ হয় তারা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন।

যে কমিটিতে থাকবেন ভিন্ন চিন্তাধারা ও মাযহাবের প্রতিনিধিরা। প্রত্যেক কমিটি প্রত্যেকটি মাযহাবের সমস্ত বই এবং লেখা জমা করবে এবং পরে তা আধুনিক ভাষায় সম্পাদনা করে একটি বইয়ে সংকলন করবে। নতুন আঙ্গিকে একটি সূচী তৈরি করবে। অথবা নতুন বই লিখে সমান লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। যা হবে চলমান ভাষা ও আঙ্গিকে। যাতে বিভিন্ন মাযহাবের উপর তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি আইন ও বিধানকে অতি আকর্ষণীয় পন্থায় উপস্থাপন করা হবে। এভাবে একটি গ্রন্থ হবে, ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। অন্যটি হবে ট্যাক্সের বিষয়ে। তৃতীয়টি হবে পার্টনারশীপ ও অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারে। চতুর্থটি হতে পারে ঋণখেলাপী এবং দেউলিয়ার ব্যাপারে। এভাবে আরও অনেক বিষয় হবে।

অধিকন্তু, আমি চাই, মুসলিম শিক্ষাবিদরা শাসক ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে বুঝাচ্ছেন, ইসলামের বিধানের সাথে যেসব আইনের বৈপরীত্য সেসব আইনের প্রতি ইসলামের কী মনোভাব। যেসব লোক এ সব রায় পাস করে এবং জারি করে তাদের প্রতি ইসলামের কী রায়।

এছাড়া আমি এও দেখতে চাই যে, মুসলিম শিক্ষাবিদরা দেখবেন যে, কোনো নতুন আইনই যেন তাদের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান ছাড়া প্রণয়ন না করা হয় এবং ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো নতুন আইনই জারি করা না হয়।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদেরা,

হুশিয়ার হোন, মুসলিম দেশগুলোর একমাত্র সংকট ইসলামের আইন ও নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ শাসকশ্রেণী এবং অজ্ঞ সাধারণ মুসলিমরা। এই পরিস্থিতি শুদ্ধ করার একমাত্র পথ হলো যে, এদেরকে ইসলামের সবকিছু শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেক দলকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেভাবে তারা অভ্যস্ত।

কোনো বিশ্বাসী মুসলিমই ধর্ম তাকে যা শিক্ষা দেয় সে ব্যাপারে যা সে জানে না, তা শিখতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। তবে ইউরোপীয় শিক্ষিতরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে, তাদের তুচ্ছজ্ঞান করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধুমাত্র বাস্তবতা বর্ণনা করেছি। আমি তো নিজেই তাদের একজন। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করার পূর্বে আমি তাদের মতোই অজ্ঞ ছিলাম। হয়তো, ইসলামি শরিয়াকে অগ্রাহ্য করতে তাদের চেয়েও আরও চরম ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ স্থির করলেন যে, আমি আমার এই পড়াশোনা ভালো কাজে রূপান্তর করবো। আমার সামনে সেই সীমা প্রকাশ করলেন যা একজন ব্যক্তিকে তার অজ্ঞতার কারণে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। আমি চাই না, আমার সাথী ভাইয়েরা এরকম নেতিবাচক অবস্থায় পড়ে থাকবে, যে অবস্থায় আমি ছিলাম। এ জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট তাওবাহ করতে থাকি।

আমি যদি আমাদের মুসলিম শিক্ষাবিদদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি, এটা তাদেরকে অবহেলা করে কিংবা দোষারোপ করার মাধ্যমে নয়। এটা হলো মাশওয়ারা বা পরামর্শ, যা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা মূলত আমার অভিজ্ঞতা এবং যারা ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছে তাদের সাথে আমার চলাফেরা করার কারণে এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, পুরো উৎসাহ ও আন্তরিকতার সাথে সমস্ত জাতিকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া হলো ইসলামের জন্য সবচেয়ে হিতকর কাজ। বিষয়টি এখন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের উপর নির্ভর করে যে, তারা আমার মতামত গ্রহণ করবেন অথবা চিরতরে উপেক্ষা করে যাবেন।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান, যে পথ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উত্তম।

এই দশার জন্য কে দায়ী?

আমাদের বর্তমান এই অবস্থার জন্য এবং ইসলামের বাস্তব হালের জন্য সব মুসলিমরা দায়ী। এই দায়ভার সকলের ঘাড়ে। হয়তো এই দায়িত্ব সমাজের এক দলের চেয়ে অন্য দলের উপর ভিন্ন। কিন্তু এই ভোগান্তির দায় কেউ এড়াতে পারবেন না। যা এসেছে, অজ্ঞতা, অবিশ্বাস, গুরুত্বদানের স্থানচ্যুতি এবং অপমান, দারিদ্রতা ও শোষণ, ঔপনিবেশিকতা ও দখলদারিত্ব থেকে।

জনসাধারণের দায়

আজকের ইসলামের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সাধারণ মুসলিমরা দায়ী। সাধারণ মানুষ যদি তাদের ধর্মের প্রতি অজ্ঞ না হতো, তাহলে ইসলাম বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় নিশ্চয় থাকতো না। তারা ক্রমশ বিচ্যুত হতো না এর অনুশাসন থেকে। তাদের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা নিজেদেরকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন ইসলামের নীতি থেকে। যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে অসচেতন।

সাধারণ মুসলিমরা মন্দ কাজে এতোই অভ্যস্ত হয়েছে যে, নাস্তিকতা ও মূর্খতাকে তারা খুব কমই বিবেচনায় আনে যে, এ সবের চর্চা ইসলামবিরোধী। অথবা তারা বিশ্বাস করে, সংগ্রাম করে এসব স্খলনকে অতিক্রম করার ব্যাপারে ইসলাম পরোয়া করে না বা এ বিষয়ে ইসলামের কোনো উদ্বেগ নেই।

যাইহোক, ইসলাম তার শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় করেছে এবং তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে। এর নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ

তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন? যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে, এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। (সুরা তাওবা, আয়াত: ১২২)

কার্যত কিছু নিষ্ঠাবান দল সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও তাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম সরকার এসব দলের সাথে লড়াই করার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়।

তারা এ সব মানুষদের ইসলামি বিধিবিধান পালনে বাধা দেয় এই আশায় যে, এসব অন্যায্য কাজের মাধ্যমে তারা উপনিবেশবাদীদের অনুকম্পা লাভ করবে। অথবা একনায়কদের মর্জির অনুবর্তী হতে তারা এ সব করে। এভাবে তারা ইসলামের শত্রুশিবিরে যোগদান করে। জনসাধারণ বংশবদের মতো তাদের সরকারের মনোভাবের প্রতি রুজু হয়, যখন তাদের উচিৎ ছিলো প্রবলভাবে প্রতিবাদ করা। আর এভাবেই ইসলামের চেতনাকে শ্বাসরোধ করতে এবং এর প্রচারকদের ধ্বংস করতে জনসাধারণ এ কাজে অংশগ্রহণ করে।

সাধারণ মুসলিমরা তাদের উচ্চ গৌরব, মর্যাদা ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তারা বর্তমানে ক্রীতদাসের মতো সেইসব দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ক্ষমতাবানদের, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ও শাসকদের পদলেহী হয়ে জীবনযাপন করছে, যারা তাদের জীবনের স্পন্দনটুকুও লুণ্ঠন করেছে। তাদের সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত করেছে। তাদের ইজ্জত লুটেছে এবং তাদের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করেছে।

সর্বকালে মুসলিমদের পতনের মূল কারণ হলো নিজেদের ধর্মকে পরিত্যাগ করা। যে ধর্ম তাদের দান করে খ্যাতি ও গৌরব। যদি কখনও তারা তাদের মুখ এর অভিমুখী করে, তাহলে তারা তাদের এই বলহীন অবস্থাকে পাল্টাতে এবং তাদের আহত মর্যাদাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। সাধারণ মুসলিমরা অপরিণামদর্শীতার এক

সর্বনাশা পথ অতিক্রম করছে। তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অমনোযোগী।

এমনকি তারা অমনোযোগী জাগতিক জীবন এবং নিজেদের ব্যাপারেও। যখন তারা সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা তাদের বর্তমান জীবনের অপচয় করছে। আখেরাতের সম্ভাবনাময় সুখের বিসর্জন দিচ্ছে। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার প্রতি অমনোযোগীতা ও উপেক্ষার মাধ্যমে এবং কুরআন থেকে বিচ্যুতির মাধ্যমে তারা আখেরাতকে বিসর্জন দিচ্ছে।

মুসলিম সরকারগুলোর দায়

ইসলামের মানহানী এবং হীন জটিলাবস্থা ও আইনহীনতার জন্য সর্বাধিক দায়ী মুসলিম সরকারগুলো। তাদের কর্মকান্ড মুসলিমদের দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। এ সব সরকারগুলো ইসলামকে জাগতিক কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা মানুষের উপর আরোপ করেছে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তার অবাধ্য হয়ে তারা জনগণকে শাসন করছে।

মুসলিম সরকারগুলো জনগণ তথা মুসলিমদের ইউরোপের পাপের দিকে পরিচালনা করছে। তারা সরে পড়েছে আল্লাহর দেওয়া ন্যায়পরায়ণতা ও সত্য পথপ্রদর্শন থেকে। তারা নিজেদের উপর মানব-তৈরি আইন আরোপ করেছে। স্বাভাবিকভাবে যেসব ভালো কাজ তাদের নিজেদের ইসলামি শরীয়ার আবেদন থেকে উদ্ভুত, তা তারা প্রত্যাখান করছে।

মুসলিম সরকারগুলো সার্বভৌমত্ব, রাজনীতি এবং প্রশাসনে ইসলামের লংঘন করছে। স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়কে রহিত করার মাধ্যমে ইসলামি নীতির সীমালংঘন করেছে। ইসলাম যা নির্ধারিত করেছে, তা তারা ত্যাগ করেছে। এমতাবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমবেদনাকে নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে, তারা তার অনুমোদন দিয়েছে।

সমান সময়ে তারা সমাজে অবিচার, বিদ্বেষ, শোষণ এবং সামন্ততন্ত্রের লালন করছে। তারা মুসলিম সমাজে দুর্নীতি, অধঃপতন, ভ্রষ্টতা, দুরাচার, আমিত্ব ও নিপীড়নের মাধ্যমে সমাজকে জগাখিচুরী করেছে। মুসলিম সরকারগুলো মুসলিমদের নিজেদের ধর্ম শিখতে, আপন রবের ইবাদত করতে এবং তাদের পবিত্র কর্তব্য পালন করতে বাধা দিচ্ছে। ইসলাম যেখানে তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে, সেখানে তারা ইসলামের শত্রুদের নিকট আনুগত্য দিচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণের সাথে যা সম্পর্কযুক্ত সেসব ব্যাপারে তারা নীরবতা পালন করে।

এ সব মুসলিম সরকারগুলো নিজেদের জনগণের উপর দুর্বলতা ও অপমান চাপিয়ে দিয়েছে। শোষণ এবং দারিদ্র জনগণের কাঁধে চাপিয়েছে। সয়লাব ঘটিয়েছে নীতিহীনতা এবং অসচ্ছরিত্রের।

মুসলিম সরকারপ্রধানদের দায়

ব্যক্তি হিসেবে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা হলো সেসব লোক, যারা ইসলামের পতনের জন্য সর্বাধিক দায়ী। যদিও মানব-তৈরি আইন তাদেরকে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে ছাড় দেয় কিংবা দোষী সাব্যস্ত করে না। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে প্রত্যেক ভুল কিংবা খারাপের দায়ভার থেকে মুক্তি দিবে না। গুরুতর কিংবা মামুলি, যার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। সত্যিকারার্থে, আমাদেরকে এসব শাসকদের মোকাবেলা করতে হবে জীবনের বাস্তবতা দিয়ে এবং এর ফ্যাক্টের ব্যাপারে তাদের চোখ খুলে দিতে হবে।

হে মুসলিম সরকার প্রধানগণ,

আপনাদের দেশের শাসন ও সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব আপনাদের হাতে। আপনাদের নিয়ন্ত্রণে হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা। ইসলামকে তার ন্যায্য অবস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী আপনারা।

আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেই উত্তরাধিকার পেয়েছেন, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আপনারা সেই উত্তরাধিকার অনুযায়ী চলা পছন্দ করেছেন। আপনাদের ক্ষমতার দণ্ড সেটার উপর প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামকে লংঘন করেছেন। হয়তো এ বিষয়ে আপনারা সচেতন কিংবা অসচেতন।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এসব লিগ্যাসী হলো প্রাথমিক উপাদান, যা আমাদের ইসলামকে দুর্বল করেছে এবং মুসলমানদের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে। জেনে রাখুন, ইসলামের দুর্বলতা আপনাদের উপরই প্রতিফলিত হবে কিন্তু এর শক্তিমত্তা আপনাদের সাহায্য যোগান দিবে। একটি দুর্বল রাষ্ট্রের রাজা, যুবরাজ কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া অনেক বেশি শ্রেয়। এতে আপনাদের স্বার্থ আরও বেশি প্রতিফলিত হবে। আর দুর্বল রাষ্ট্রের রাজা হলে আপনি মূলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হবেন। যারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কলকব্জা ধ্বংস করে অথবা প্রভাবিত করে। এর কর্মকর্তাদের নিয়োগ কিংবা বরখাস্ত করে। তারা ক্ষমতার গদি নাড়িয়ে দেয় এবং শাসকদের প্রতি চোখ রাঙায়।

হে সরকার প্রধানরা,

আপনারা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত। আপনাদের কাজ হলো নিজেদের বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা। আপনারা পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘাতে লিপ্ত। আপনাদের উচিৎ হলো, একে অন্যের সাথে হাতে হাত মিলানো এবং একে অন্যের সহকর্মী বনে যাওয়া। এতে আপনাদের ও ইসলামের স্বার্থ রক্ষা হবে। এটা আপনাদের জন্য এবং ইসলামের জন্য অনেক ভালো হবে। সর্বপ্রথম আপনারা মুসলিম। সুতরাং ইসলামকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখুন। নিজেদের আত্মসমালোচনা নিজেরা করুন। এটাকে আপনাদের শাসনের বুনিয়াদ হিসেবে রেখে এর উপর ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তুলুন।

ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পথে নিজেদেরকে নড়বড়ে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবেন না। কেননা আপনারা মরণশীল এবং নিশ্চিতভাবে আপনারা মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যুর পর জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনাদের কেউই রাজ্য, সম্পদ ও বংশ দ্বারা উপকৃত হবেন না। আপনাদের ভালো কাজ এবং আল্লাহর ওয়াস্তে যে সেবা করেছেন তা-ই গণনায় আসবে।

আপনাদের জন্য তো এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে, ইতিহাসে আপনারা এমন এক শাসক হিসেবে গণ্য হবেন, যারা ইসলামি রাষ্ট্র এবং ইসলামি আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছে। যারা নিজেদের মসনদ ও অনাবিল প্রাচুর্যের কারণে এবং অনমনীয় আসক্তির মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা কিংবা বিলম্ব করায়নি। যা ইসলাম এবং মুসলমানদের কাছে সমানভাবে অগ্রহণযোগ্য।

সকল সমস্যার সুরাহা করতে আপনাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট। আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লোভকে পরাস্ত করার শক্তিশালী ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুর দরকার নাই। আপনারা যদি এমন অটল ক্ষমতা ও দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী হন, তাহলে আপনারা অন্য সবকিছু জয় ও অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের লক্ষ্যের প্রতি মুখোমুখি হতে লজ্জাবোধ করেন, ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ এবং ক্ষমতা ও জাকজমকের প্রলোভন বাদ না দেন, তাহলে মুসলিমরা বিভক্ত, অপদস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্বল হতে থাকবে। এভাবে আপনারা এবং আপনাদের মুসলিম জনগণ শক্তিশালী অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা অনুগত এবং অপদস্ত হতে থাকবে। ঔপনিবেশিক ও দুশ্চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত হতে থাকবে। আপনারা এবং আপনাদের মুসলিম নাগরিকরা পুতুল ও ছায়ার মতো 'বড় শক্তির' দ্বারা ভুল পথে চলবে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। যারা আপনাদের মেকি সমর্থক হওয়ার মাধ্যমে শোষণ ও উপহাস করে।

তারা ভালো করেই জানে, ক্ষমতা টিকে থাকে ঐক্যের উপর এবং বিজয় তাদের সাথে থাকে যারা ক্ষমতার অধিকারী।

হে সরকার প্রধানরা, নিজেদের মর্যাদাপূর্ণপদ, সম্ভ্রান্ত উপাধি ও রত্নখচিত রাজমুকুটের মধ্যে আকঁড়ে থাকবেন না। কেননা এসব প্রবলপ্রতাপ অযোগ্যদের ক্ষমতায় পড়ে থাকার আগ্রহ মুসলিম দুনিয়ার অধঃপতনের জন্য দায়ী ছিলো। তারা দায়ী ছিলো ইসলামের চেতনাকে স্তব্ধ করতে। দুর্বল রাজ্যে বিভাজন করতে। তারা দায়ী ছিলো ক্ষুদে রাষ্ট্রে বিভক্তি, অরক্ষিত ও অসহায় শাসনের জন্য। মুসলিমরা প্রমাণ করেছে, যদিও তাদের সংখ্যা প্রচুর, তাদের ভূমির বিশালতা, বস্তুগত (খনিজ) সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনশক্তি থাকা স্বত্ত্বেও এবং সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকার পরও তারা প্রমাণ করেছে তারা এই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বলের চেয়েও দুর্বল। সবচেয়ে বেশি অপদস্ত এবং অন্যান্য জাতির নিকট সবচেয়ে বেশি অসম্মানিত।

আপনারা যদি প্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন নিজেদের স্বার্থ, পদ, খেতাব এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে, তাহলেও আপনাদের অবশ্যই যেকোনো পরিস্থিতিতে একত্রিত হতে হবে। আপনাদের দেশগুলোর বাহিনীকে একত্রিত করতে হবে, যাতে মুসলিমরা একটি বাহিনীতে একত্রিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করতে পারে।

হে সরকার প্রধানরা, আপনাদের এই পদ, পদবী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সামনে কোনো কাজেই আসবে না। যিনি আপনাদের এবং আপনাদের পূর্বসূরীদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যা আপনাদের ভূমিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত ছিলো। তিনি আপনাদেরকে মুসলিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন, যাদের একতা আপনারা ভঙ্গ করেছেন। যাদের ক্ষমতা আপনারা ধবংস করেছেন। যাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিস্বত্তা আপনারা কেটে বিভক্ত করেছেন। তাদেরকে বিতর্কের প্রতীক বানিয়েছেন। তাদের শক্তি নিঃশেষিত করেছেন।

তাদেরকে অপদস্ত করেছেন এবং লালসা দিয়ে লাঞ্চিত করেছেন, যা একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষকে লজ্জা দেয় এবং অপমানিত হয়ে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য করে।

হে সরকার প্রধানরা,

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব আঁকড়ে থাকবেন না। স্মরণ করুন রাসুল (সা.) বলেছেন:

أنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة

দেখুন ক্ষমতা হলো একটি বিশ্বাস। যে ব্যক্তি বৈধভাবে তা হস্তগত করবে এবং এর যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করবে, সে আখেরাতে বাঁচতে পারবে। এর দায়িত্ব তার ন্যায্য মালিকের নিকট পেশ করুন। কেননা আল্লাহ এজন্য আখেরাতে আপনাদের দায়ী হিসেবে ধরবেন।

রাসূল (সা.) আবুযর (রাযি.) কে দেওয়া পরামর্শ মনযোগ দিয়ে ধরুন। যখন তিনি রাসুলের কাছে তাকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন:

يا ابا ذر إنك ضعيف وإنها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها -

হে আবুযর! তুমি নম্র। এটা (সরকারি দায়িত্ব) হলো একটি ওয়াদা, যা কেয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হবে। যে তা গ্রহণ করবে সে ব্যর্থ হবে, যদি না সে তা বৈধভাবে দখল করে থাকে এবং এর সকল দায়িত্ব পূর্ণ করে।

মুসলিম শিক্ষাবিদদের দায়

মুসলিম শিক্ষাবিদরাও (উলামা) আমাদের এই অগ্নিপরীক্ষা এবং ইসলামের এই দুর্দশার জন্য দায়ী। তারা ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট পাপ ও নষ্টামীর জন্য দায়ী।

তারা শাসক ও সরকারের দ্বারা সৃষ্ট পাপ এবং জনসাধারণ যারা মূর্খ তাদের এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তাদের পাপের জন্য দায়ী। এই আলেমরা এসব দোষারোপের উপযুক্ত, কেননা তারা সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছেন, অথবা কমপক্ষে এর জুলুমের সামনে নীরব থাকেন। তারা অনৈসলামিক শাসনকেও মাঝে মধ্যে সমর্থন করেন এবং কখনও আপোস করে চলেন। তারা জনসাধারণকে ইসলামের মৌলিক নীতির ব্যাপারে অজ্ঞতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে গঠিত চক্রান্তের ব্যাপারে অসতর্কতার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। আলেমরা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, কেননা তারা ব্যর্থ হয়েছেন জনসাধারণকে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপারে ইসলামের রায় জানাতে। তারা ব্যর্থ হয়েছেন সরকারকেও এই রায় জানাতে, যারা ওই শক্তিগুলোকে সহায়তা, ট্যাক্স এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে সাধারণ মুসলিমরা প্রো-কলোনিয়ালিস্ট সরকারের অনুবর্তী হয়। ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে মুসলিম শিক্ষাবিদ এবং সাধারণের নীরবতার কারণে।

অন্য কথায়, তারা ধর্মকে পরিত্যাগ করার কারণে এরকম ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। জনগণ হয়তো এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারতো, কেননা তারা বিশ্বাস করতো, মুসলিম শিক্ষাবিদরা কোনো কিছুই অনুমোদন করতো না, যদি না তা ইসলামের শিক্ষার ও আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুসারে না হতো।

মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। মুখে তারা কুলুপ দিয়েছেন। আর কানে দিয়েছেন আঙ্গুল। ইসলামের কথা ভুলে তারা শত বছর ঘুমিয়ে রয়েছেন আর এমন অবস্থায় মুসলিমরা তাদের ঘুমন্ত অবস্থার অনুসরণ করছে।

জনগণ এই বিশ্বাসে অনুসরণ করছে যে, তাদের ইসলাম ছিলো সেইফ এন্ড সাউন্ড। অন্যথায় তাদের আলেমরা কখনও নীরব থাকতেন না। দীর্ঘকাল থেকেই মুসলিম শিক্ষাবিদরা ইসলামকে উপেক্ষা করেছেন। তারা কখনও ইসলাম অবমাননার কোনো কার্যের নিন্দা করেননি। কিংবা তারা ইসলামি নীতির বিপরীতে চালু হওয়া কোনো অনুশাসনকে প্রত্যাহার ও নাকচ করতে চেষ্টা করেননি। তারা কখনও ইসলামি শরিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে একটি সমাবেশে মিলিত হননি।

শাসকরা যখন গুরুতর অপরাধ করেছে, অবৈধকে অনুমোদন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, নষ্টামির বিস্তার ঘটিয়েছে, এবং আল্লাহর দেওয়া সীমা অতিক্রম করেছে, এমতাবস্থায় শিক্ষাবিদরা এসব কাজের যথোচিত বিরুদ্ধাচরণ ও ধিক্কার জানাননি। তারা শুধুমাত্র নীরবতাই অবলম্বন করেছেন, যেন ইসলাম তাদের কাছে দাবি রাখেনি, অন্যদের সৎকাজে আহবান করতে ও অসৎকাজে নিষেধ করতে। তাদের উপর যেন আবশ্যকীয় করা হয়নি, শাসককে পরামর্শ দিতে, যাতে তারা ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করে।

মুসলিম দেশগুলো যখন বিদেশী শক্তির দ্বারা অধিকৃত হলো তখন আমাদের আলেমরা এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি। এমনকি তারা জনগণকেও বলেননি যে, আক্রামণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দখলদারদের প্রতিরোধ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ'য় কী বক্তব্য আছে। যারা এসব আক্রমণকারী ও উপনিবেশবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের ব্যাপারে ইসলাম কী বক্তব্য দিয়েছে। মুসলিম আলেমদের একটি দায়িত্ব ছিলো অমুসলিম আক্রমণকারীদের বয়কট করা। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের বন্ধু ও মিত্রশক্তি বনে যায়। এমনকি তারা অধিকৃত দেশের প্রতিনিধিদের বাসস্থানে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পর্যন্ত পালন করতে থাকে!

মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক মানব- তৈরি আইন জারি হলো। ইসলামের হুকুম বাতিল করা হলো। আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা হলো এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা হলো। তবুও মুসলিম শিক্ষাবিদরা তাদের ধর্মের এই লংঘনে উত্তেজিত হলেন না। তারা তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও শংকিত হলেন না। যদিও তারা ইসলাম বেচে তাদের জীবিকা অর্জন করলেন। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য এবং তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলীর দুঃখজনক আবর্তনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো সমাবেশেরও আয়োজন করলেন না।

সর্বব্যাপী ব্যভিচার ও কামুকতা বিস্তার লাভ করলো। পতিতালয় ও নৃত্যশালা খোলা হলো। সরকার মুসলিম নারীদের পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স দিলো। মানুষ প্রকাশ্যে ইসলাম অমান্য করলো। তা স্বত্তেও আমাদের শিক্ষাবিদরা নিজেদের সংযত রাখলেন এবং এ সব নোংরা কাজের ব্যাপারে 'দুঃখপ্রকাশ' এর বেশি আর কিছুই করলেন না।

যখন ধর্মনিরপেক্ষতা (সেক্যুলারিজম) প্রতিষ্ঠিত হলো, যা ধর্মীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করে। আমাদের মুসলিম শিক্ষাবিদরা সর্বপ্রথম তাদের বাচ্চাদের সেখানে দিলেন। যখন খ্রিষ্টবাদের প্রচার ও মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরাতে মিশনারি স্কুল খোলা হলো, আমাদের মাথার তাজ সম্ভ্রান্ত শিক্ষাবিদরা তাদের মেয়েদেরকেও সেখানে ভর্তি করালেন। যাতে তারা বিদেশী ভাষা, নৃত্য এবং খ্রিষ্টবাদ শিখতে পারে।

যখনই কোনো সরকার কোনো মারাত্মক সমস্যায় পড়তো, তারা এ সব প্রতারক শিক্ষাবিদদের বাগিয়ে নিতো। যারা কখনো 'তাদের সরকারকে মানতে' মুসলিমদের নিলাম করতে ব্যর্থ হয়নি। যদিও এই সরকার মদ, ব্যভিচার, সুদ, নাস্তিকতা ও নষ্টামির অনুমোদন দিয়ে থাকে। যদিও এরা তাদের জনপ্রিয় খোশখেয়াল ও দলীয় শৌখিনতার কারণে ইসলামকে খারিজ করে থাকে।

এ সব কার্যকলাপ এতো লম্বা সময় ধরে চলতে থাকলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা নির্বোধের মতো বিশ্বাস করে বসলো যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদের ইসলামে টিকে থাকার জন্য কোনো প্রতিবন্ধক নয়। এতে ইসলামের কোনো বিধান লংঘিত হচ্ছে না। আশ্চর্যের কিছু নেই, তারপর অন্যায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত কাজে আমাদের জীবন ভরে উঠলো। আর এর প্রতিকারের প্রচেষ্টা প্রায় অকার্যকর হয়ে গেলো। এসব ঘটলো, মুসলিম পন্ডিতদের দুর্বলতার কারণে এবং ইসলামি শরিয়া প্রয়োগের বিষয়ে তাদের পাপাচারী মনোভাবের কারণে।

সত্যিকার আলেমরা হলেন রাসুলের ওয়ারেস। এটা আলেমদের জন্য খুবই বেমানান যে তারা রাসুলের এই উত্তরাধিকারের প্রতি এমন ধৃষ্ট আচরণ দেখাবেন। ইসলাম তাদের উপর এই কর্তব্য আরোপ করেছে যে, মানুষকে ভালো কাজ সম্পাদনের আদেশ দিতে হবে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। আলেমরা যদি এই দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে নিতে প্রত্যাখান করেন, তাহলে কে এই ভার গ্রহণ করবে?

হাস্যকর ব্যাপার হলো, মিশরের শিক্ষাবিদরা পরবর্তীতে তাদের গলার সুর ফিরে পান এবং তারা তাদের দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করেন। তারা সমাবেশে জমায়েত হয়ে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের আহবান জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাদের এই বক্তব্য কি ইসলামের জন্য এবং তার শরিয়া বলবৎকরণের জন্য ছিলো? মোটেই তা নয়; তারা বিদ্রোহ করেছেন এবং অন্যদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছেন তাদের পদ, ভাতা, বেতন ও কায়েমী স্বার্থের কারণে। তারা ইশতেহার প্রকাশ করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন। যা ভরপুর ছিলো কুরআনের আয়াত ও হাদিসের উদ্ধৃতি দ্বারা। এসব তারা করেছেন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থে এবং স্বতন্ত্র সম্মান বজায় রাখতে। তারা এসব ইসলামের জন্য করেননি।

তাদের কাছে নিজেদের গুরুত্বের চেয়ে ইসলামের গুরুত্ব ছিলো কম এবং তাদের কাছে ইসলামের মর্যাদার চেয়ে তাদের মর্যাদা ছিলো বেশি। এটা খুবই বেদনাদায়ক ছিলো, যখন দেখা গেলো, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের সমাবেশে ইসলামি সহানুভূতির ডাক দিলেন। চেষ্টা করলেন এই বিদ্রোহকে সত্যিকার ইসলামি সংস্কারের দিকে পরিচালনা করতে। এমতাবস্থায় তাদের সহকর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাদের প্রত্যাখান করলেন এবং তাদের প্রয়াসকে বানচাল করলেন। এটাই তখন প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, এই শিক্ষাবিদদের কাছে ইসলাম পুনরুজ্জীবনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলো।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা,
আপনারা জাতি ও সরকার দ্বারা লাঞ্ছিত এবং উপেক্ষিত হয়েছিলেন। কেননা আপনারা নিজেদের ধর্মের প্রতি মনযোগী হননি এবং তা উপেক্ষা করেছেন।
হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা, আপনাদের মর্যাদা কেবলমাত্র ইসলাম থেকে আসে। আপনাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা একমাত্র ইসলামই প্রদান করে।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা,
ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতিও নেই যে, আপনারা আল্লাহর আইনের কথা বলতে ও নির্দেশনা দিতে আপনাদের জিহ্বাকে সংযত রাখবেন। আপনারা আল্লাহর শত্রুদের দিকে চোখ বন্ধ রাখবেন, যারা তার বিচারিক সিদ্ধান্তের নীতিগুলোকে কলুষিত করেছে। ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতি নেই যে, আপনারা ছাত্রদের ইসলামি আইন শিক্ষা দিবেন; কিন্তু সরকারে তা বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন নেই।

ইসলামের কোথাও এমন একটি নীতি নেই যে, আপনারা মসজিদে দাঁড়িয়ে মানুষকে ভালো আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের ডাক দিবেন, এমতাবস্থায় তাদেরকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে রাখবেন। তাদের বলবেন না, রাজনীতি, সরকারি প্রশাসন, আইন প্রনয়ণ, ন্যায়বিচার, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, মিত্র এবং যুদ্ধরতদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে। কেন আপনারা মানুষকে তাদের ধর্ম পুরোপুরি শিক্ষা দেন না। আপনাদের পেশার দাবি তো তাই।

আপনারা কেন মানুষদের বলেন না, আক্রমণাত্মক দখলদার এবং আগ্রাসী হামলাকারীদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? যারা আক্রমণকারীদের সহযোগিতা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? আর যারা এরকম শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, বিদ্রোহ করে, তাদের ব্যাপারে হুকুম কী?

আপনারা কেন মানুষকে বলেন না, যারা মুসলিমদের উপর তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো কিছু আরোপ করে, সেসব লোকদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? ইসলাম কি এসব লোকদের আনুগত্য এবং তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বিধান দেয়? অথবা ইসলাম কি এসব লোকদের অবাধ্য হতে এবং তাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কোনো বিধান দেয়?

আপনারা কেন মানুষের সামনে ঘোষণা করেন না, ইসলাম মুসলিমকে মানব-তৈরি আইন মেনে নিতে নির্দেশ দেয়, না তা অস্বীকার করতে নির্দেশ দেয়? আপনারা কেন মানুষের সামনে দৃঢ়সংকল্পতার সাথে স্পষ্ট করেন না, সম্পদ, শোষণ ও একাধিপত্যের ব্যাপারে ইসলামের রায় কী? বর্তমান আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ইসলামের রায় কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

আপনারা কেন মানুষকে অবহিত করেন না, ইসলামের সে বিধান, যা নিষিদ্ধ করেছে অত্যধিক সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে এবং

সর্বনাশা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। আপনারা কেন উচ্চকণ্ঠে তাদের নিয়তির ব্যাপারে ইসলামের রায়ের কথা ঘোষণা করেন না, যারা ইসলামের প্রচারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেন ঘোষণা করেন না, ইসলামের জন্য যারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে, তাদের নির্যাতনকারীদের যারা সহায়তা করে তাদের ভাগ্যলিপিতে কী সংরক্ষিত আছে।

আপনারা কেন নির্ভয়ে ব্যাখ্যা করেন না, সেসব লোকদের প্রতি ইসলামের অবস্থান কী, যারা স্বেচ্ছাচারী রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামের মানদন্ড থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ইসলাম কি বিশ্বাসীদের এসব অনধিকারচর্চার ব্যাপারে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়, না এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং তা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়?
আপনারা কেন পরামর্শ এবং ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে ইসলামের নীতি মানুষের জন্য সরল করে দেন না। এগুলো কি সারাজীবনে একবার প্রতিপাদিত করলেই হবে। অথবা দুটিই হলো বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না এর প্রয়োজন আছে। যাতে এভাবে মানুষকে সবসময় ইসলামি আইন স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। আপনারা কেন মানুষকে আগ্রহচিত্তে উপদেশ দেন না, সেসব মহামূর্খদের ব্যাপারে ইসলামের রায় কী, যে তার নিজের জন্য সম্মান দাবি করে কিন্তু ইসলামের জন্য সম্মান দাবি করতে অস্বীকার করে।

হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা, আমি স্বীকার করি, আপনাদের মধ্যেও একটি ছোট এবং সম্মানিত দল আছে, যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করে এবং এর শিক্ষাকে মেনে চলে। আমি এও স্বীকার করি যে, আপনাদের মধ্যে কিছু লোক কুরআনের নীতি প্রতিষ্ঠায় তাদের সময়, শক্তি এমনকি জীবনও বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা প্রতিরোধের তোয়াক্কা করেননি। কিন্তু এরা সংখ্যায় অবশ্যই নগন্য এবং তারা অবশ্যই আপনাদের সাথে শ্রেণীভুক্ত হতে ঘৃণা করবে।

এই স্বল্পসংখ্যক ভালো ও সদাশয় মানুষের কার্যক্রম আপনাদের পাপের ক্ষতিপূরণ করবে না। শাস্তিও প্রশমিত করবে না, যা আপনাদের গাফলতি এবং লোলুপতার মাধ্যমে অর্জিত।
হে মুসলিম শিক্ষাবিদরা, এই ন্যায়নিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র লোকদের উদাহরণ অনুসরণ করুন। তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করুন। ইসলামের জন্য কিছু একটা করুন। আপনাদের দীর্ঘ নীরবতা এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট হয়েছে। এখন শুধু ইতিবাচক কর্মে আপনাদের ও আপনাদের ধর্মের ভালো নিহিত আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডন্টে অর্গানাইজেশন*

লেখক পরিচিতি

কাযি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ মিশরের বিচারক ছিলেন। ১৩২১ হিজরি মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের দাকহালিয়াহ প্রদেশের কাফরুল হাজ্জ নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রো ইউনিভার্সিটির কুল্লিয়াতুল হুকুক-এ অধ্যয়ন শুরু করেন। এরপর ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে প্রথম স্থান লাভ করে স্টাডি সমাপ্ত করেন। সহকারি কাযি (বিচারক) হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রধান কাযি নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে তাঁর অনেকগুলো কীর্তি রয়েছে। যেগুলো দৃষ্টান্তমূলক। যেমন মিশরের শাসক আব্দুল হাদির যুগে তিনি কাযি থাকা অবস্থায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিরুদ্ধে মিলিটারি সম্পর্কিত অনেকগুলো মামলা তাঁর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। তিনি সবকটি মামলায় তাদের নির্দোষ সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছিলেন। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বেআইনি। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ইখওয়ানুল মুসলিমিন আবদুল কাদির আওদাহকে দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে বিচারকের চাকরি থেকে অবসর নিতে অনুরোধ জানায়। ফলে তিনি কাযির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মেজর জেনারেল মোহাম্মাদ নাজিবের যুগে তিনি মিশরের সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। এই সংবিধান রচনায় স্বাধীনতা রক্ষা, সংবিধানে ইসলামি মূলনীতির স্পষ্ট ভিত্তি এবং কুরআনি শিক্ষার উপর সংবিধান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অতি উজ্জল ও অবিস্মরণীয়।

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়া সরকার তাকে লিবিয়ান সংবিধান রচনার জন্য নিয়োগ দেয়।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুলাইয়ের বিদ্রোহে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তৎপরতা এবং সরকারের পক্ষ থেকে তারা সমালোচিত হওয়ার পর যখন ইখওয়ান ও জামাল আব্দুন নাসেরের মাঝে বিরোধিতার আগুন জ্বলে উঠল, তখন বীর মুজাহিদ আবদুল কাদির আওদাহ কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখিন হতে লাগলেন।

এই পর্যায়ে তিনি জামাল আব্দুন নাসেরের রচিত محكمة الشعب (মাহকামাতুশা'ব) 'জনতার আদালত' নামক রচনার তুমূল সমালোচনা করলেন। তাঁর সমালোচনার উপর জামাল আব্দুন নাসেরের মন্তব্য ছিল: আবদুল কাদির আওদার এই প্রয়াস শুধুমাত্র ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তিনি ইসলামি শরিয়াহকে পূণঃবাস্তবায়ন করা এবং শরিয়াহ সম্পর্কে অজ্ঞদের অমূলক দাবির সংশোধন করারও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই সূত্রে তাঁর প্রথম রচনা ছিল– الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه

'অশিক্ষিত অনুসারী ও অযোগ্য আলেমদের মাঝে ইসলাম', (ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ) যাতে তিনি শরিয়াহ'র এমন জরুরি বিষয়াবলী একত্রিত করেছেন, যা প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের জানা একান্তই জরুরি। তিনি এই আশায় পুস্তিকাটি রচনা করেন, যাতে এটি সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিতদের চিন্তাধারার সংশোধন করে এবং আলেমদের চলার পথে উদ্দীপনা ও জাগরণ সৃষ্টি করে। যার সাহায্যে তারা আমাদের এই সংকটময় মূহুর্তে ইসলামের সঠিক খেদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে নয়া দিগন্তের সূচনা করেন।

কাযি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন শরিয়াকে প্রতিষ্ঠা জন্যে। তাঁর রচনা- الاسلام وأوصاعنا السياسية 'ইসলাম এবং আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা' পুস্তিকায় তিনি শাসন ব্যবস্থায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। আবদুল কাদির আওদাহ ছিলেন একজন আলেম ও ফক্বিহ হিসেবে বিখ্যাত। তিনি যেমন ছিলেন একজন ঝানু আইনজ্ঞ, তেমনি ছিলেন একজন সুভাষী খতীব। তিনি মিসরের দেওয়ানি আইনের

উপর অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। যা তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে স্টাডি করেছেন এবং কাযি ও আইনজীবি হিসেবে চর্চা ও বাস্তবায়ন করেছেন।

শাইখ আওদাহ ছিলেন তৎকালীন সময়ের ইসলামি ফিক্বহ সম্পর্কে অন্যতম জ্ঞানীদের একজন। ইসলামি শরিয়াহ'র মহব্বত তাকে ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যায়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং মিসরের আদালতে কাযি হিসেবে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাকে এই আস্থা ও বিশ্বাস দান করেছিল যে, শরিয়ার বাস্তব ও গভীর জ্ঞান অর্জন এবং প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

বিচার ব্যবস্থায় শাইখ আওদার অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন কাযিদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কারণ তিনি আসমানি অনুশাসন ছাড়া অন্যসব নীতি প্রতিষ্ঠাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এবং জমিনের অনুশাসনের আজ্ঞাবহ হওয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যা মানবজাতিকে তাদের কাঙ্খিত শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যার্থ হয়েছে। তিনি সত্যের পক্ষে একজন আপোষহীন বীর ছিলেন। যদিও গোটা দুনিয়া তাঁর বিরোধিতা করতো। কারণ তিনি তাঁর প্রভুর সন্তুষ্টিলোভী ছিলেন। মানুষের সন্তুষ্টির চিন্তাকে দূরে ফেলেছিলেন।

তিনি উস্তায হাসানুল বান্নার সাথে পরিচয় লাভ করেছিলেন। এবং তাঁর অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছিলেন। উস্তায হাসানুল বান্না প্রায়ই তার কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতেন।

শহীদ আবদুল কাদির আওদাহর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে-

(১) التشريع الجنائي في الإسلام - 'ইসলামের ফৌজদারি নীতি',

(২) الإسلام وأوضاعنا السياسية 'ইসলাম এবং আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা'।

(৩) المال و الحكم في الإسلام'ইসলামে সম্পদ ও শাসন'

শাহাদাত

কাযি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহকে এমন একটি অভিযোগে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যার সাথে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। আর সেই অভিযোগ হচ্ছে, তিনি জামাল আব্দুন নাসেরকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

মূলত তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত করার কারণ ছিল তাঁর ব্যতিক্রম ও মহান ব্যক্তিত্ব, বৈপ্লবিক যোগ্যতা, জিহাদ এবং সংকটময় পরিস্থিতির উপর ধৈর্যধারণ এবং সত্যের পক্ষে দুঃসাহসিকতা। উদাহরণস্বরূপ, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পক্ষাবলম্বন করা, তাদের বিরুদ্ধে জামাল আব্দুন নাসেরের গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং অভিযোগের কঠোর বিরোধিতা করা। এবং এই ক্ষেত্রে শাইখের প্রতি জামাল আব্দুন নাসেরের প্রস্তাবসমূহকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা। ব্রিটিশ দখলদারিত্বকে প্রত্যখ্যান এবং ঘোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করা।

জেনারেল মুহাম্মাদ নাজিবের অপসারণের বিরুদ্ধে শাইখের আন্দোলনের ডাকে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়। এবং এই আন্দোলন দাবি আদায় করিয়ে ছাড়ে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর শাইখ আবদুল কাদির আওদাহ এবং তার পাঁচজন সাথীর ফাঁসির দিন ধার্য করা হয়।

শাইখ আওদাহ এই কথা বলতে বলতে ফাঁসির মঞ্চে এলেন: *“কীসে আমাকে বিষন্ন করবে যে, আমি মরছি- বিছানায় নাকি যুদ্ধের ময়দানে, বন্দি দশায় নাকি স্বাধীন অবস্থায়? আমি তো আমার প্রভুর সাক্ষাতে যাচ্ছি!”*

এরপর উপস্থিত লোকজনদের লক্ষ্য করে বললেন: আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্যে ধন্য করেছেন। আমার রক্ত বিদ্রোহের গায়ে বিস্ফোরিত হবে এবং জালেমের জন্য অভিশাপ হবে।

আল্লাহ তায়ালা ঠিকই তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। ফলে জালেমদের কেউই দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিশোধ থেকে পালাতে পারেনি।

আল্লাহপাক আলিম, আমিল, কাযি, ফক্বিহ, মুজাহিদ, শহীদ উস্তায আবদুল কাদির আওদার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে এবং তাঁকে আম্বিয়া সালিহিন সিদ্দিকিন এবং শহীদদের সঙ্গে মিলিত করুন।

লেখক পরিচিত অংশটুকু এই বইয়ে যুক্ত করার জন্য তা প্রস্তুত করে দিয়েছেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মারুফ।

আহরার

Islamer Chintaa o Ekdol Bhul Manush
Translated by Husain Ahmed
Ahrar Publisher's Sylhet.
ISBN 978-984-91697-0-3
Price : Tk.150, UK £10